দাম : বারো টাকা

স্বস্তিকা

বাঙ্গালি হিন্দুকে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার পথপ্রদর্শক ঋত্বিক ঘটক

— পৃঃ ১৭

পেগাসাস নিয়ে বালখিল্য আচরণ বিরোধীদের

— পৃঃ ১৯

৭৩ বর্ষ, ৪৯ সংখ্যা।। ২৩ আগস্ট, ২০২১ ।। ৬ ভাদ্র - ১৪২৮।। যুগাব্দ ৫১২৩ ।। website : www.eswastika.com

DURO™

60 years of quality and innovation. For generations of happy customers

LIFETIME GUARANTEE FROM INSECT INFESTATION | LOW EMISSION CONFORMING TO E1 GRADE | DOUBLE CALIBRATED TECHNOLOGY | TRIPLE HEAT TREATED

Duroply Industries Limited
BLOCK BOARD · PLYWOOD · VENEERS · DOORS

Toll Free: 1800-345-3876 (DURO) | **Website:** www.duroply.in
E-Mail: corp@duroply.com | **Find us on:**

স্বস্তিকা

।। বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক।।

৭৩ বর্ষ ৪৯ সংখ্যা, ৬ ভাদ্র, ১৪২৮ বঙ্গাব্দ

২৩ আগস্ট - ২০২১, যুগাব্দ - ৫১২৩,

Website : www.eswastika.com

সম্পাদক : রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সহ সম্পাদক : সুকেশ চন্দ্র মণ্ডল

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

দূরভাষ :

সম্পাদকীয় : ৮৪২০২৪০৫৮৪ (W)

সার্কুলেশন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৫

সার্কুলেশন হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

দাম : ১২ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৫০০ টাকা।

Postal Registration No.- KOL RMS/048/2019-2021

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

ওঁ স্বস্তিক প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে প্রকাশক এবং মুদ্রক সারদা প্রসাদ পাল কর্তৃক ২৭/১বি, বিধান সরণি, কলকাতা-৬ থেকে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাশ বোস স্ট্রীট, কলকাতা-৬ হতে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

এ কি মমতার মারণখেলা □ নির্মাল্য মুখোপাধ্যায় □ ৬

হিন্দুত্বের বিনাশ চাই □ সুন্দর মৌলিক □ ৭

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গীতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা □ এ. রঘুরাম রাজু □ ৮

আফগানিস্তানে তালিবান রাজ : সতর্কতা প্রয়োজন এরাজ্যেও □ বিশ্বামিত্র □ ১০

অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যের মূলে রয়েছে দায়বদ্ধতা □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১১

খেলো ইন্ডিয়ার সিঁড়ি ভেঙে অলিম্পিকের পোডিয়ামে □ নিখিল চিত্রকর □ ১৩

তৃণমূলের নাটকে ত্রিপুরার দুয়ো □ বিশ্বপ্রিয় দাস □ ১৫

বাঙ্গালি হিন্দুকে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার পথপ্রদর্শক ঋত্বিক ঘটক □ রুদ্রপ্রসন্ন ব্যানার্জি □ ১৭

পেগাসাস নিয়ে বালখিল্য আচরণ বিরোধীদের □ সুদীপ নারায়ণ ঘোষ □ ১৯

ভারতের সোনালি রুপালি ছেলেমেয়েরা □ নিলয় সামন্ত □ ২৩

মিলখা থেকে উষা হয়ে নীরজ □ মানস পাল □ ২৬

অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয় □ রাজীব চক্রবর্তী □ ২৯

অলিম্পিকের নায়ক থেকে সিনেমার খলনায়ক □ অনামিকা দে □ ৩০

রামমোহন ছিলেন বাঙ্গলার নবজাগরণের পথিকৃৎ □ রাজদীপ মিত্র □ ৩৩

সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টির আদি তত্ত্ব □ অমিত ঘোষ দস্তিদার □ ৩৪

নাবালিকা বিধবার মন তাঁর মতো কেউ বোঝেননি □ মণীন্দ্রনাথ সাহা □ ৩৫

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পুনরবলোকন □ দত্তাত্রেয় হোসবলে □ ৩৭

সাতজন কোনিকে দেখলে আপনি কী বলতেন ক্ষিতদা □ সন্দীপ চক্রবর্তী □ ৪৩

নীলরতন সরকারের নাম শুনলে অর্ধেক রোগ সেরে যেত □ ড. বিপুল সরকার □ ৪৫

গোয়াতেই বিশ্বের সব সেরা সৈকত □ সুজিত চক্রবর্তী □ ৪৮

নিয়মিত বিভাগ

অঙ্গনা : ২১ □ সুস্বাস্থ্য : ২২ □ রঙ্গম : ৩৯ □ নবাঙ্কুর : ৪০-৪১ □

প্রকাশিত হবে ৩০ আগস্ট ২০২১

স্বস্তিকা

প্রকাশিত হবে ৩০ আগস্ট ২০২১

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

দেবকীর অষ্টমগর্ভের সন্তান কংসের নিধনের কারণ হবে— শ্রীকৃষ্ণের জন্মের আগে এমনই দৈববাণী হয়েছিল। সেই দৈববাণীকে সার্থক করে জন্মাষ্টমী তিথিতে জন্মগ্রহণ করেন শ্রীকৃষ্ণ। দিনটি হিন্দুদের কাছে পরম পবিত্র দিন। স্বস্তিকা পত্রিকার জন্মও এই দিনে। তাই স্বস্তিকার আগামী সংখ্যার বিষয় শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী। শ্রীকৃষ্ণের জীবনের নানা কর্মকাণ্ড নিয়ে লিখবেন বিশিষ্ট লেখকেরা।

দাম একই থাকছে— মাত্র ১২ টাকা।

বিজ্ঞপ্তি

স্বস্তিকার সকল গ্রাহক ও প্রচার প্রতিনিধিদের অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, তাঁরা যেন তাঁদের দেয় টাকা নিম্নবর্ণিত ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে **NEFT**-র মাধ্যমে সরাসরি জমা দেন। যে কোনো ব্যাঙ্কের শাখা থেকে টাকা পাঠাতে পারেন।

টাকা পাঠিয়ে স্বস্তিকা দপ্তরে অবশ্যই জানাবেন।

ফোন : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪,

৮৬৯৭৭৩৫২১৫,

হোয়াটস্ অ্যাপ নম্বর : ৮৬৯৭৭৩৫২১৪

Account Name : **OMSWASTIK PRAKASHAN PVT. LTD.**

A/C. No. : **917020084983100**

IFSC Code : **UTIB0000005**

Bank Name :

AXIS Bank Ltd.

Branch : **Shakespeare Sarani Kolkata-71**

স্বস্তিকা

পূজা সংখ্যা : ১৪২৮

মহালয়ার আগেই প্রকাশিত হবে

পরিবারের সবাই মিলে পড়ার মতো পত্রিকা

অন্যান্য বছরের মতো এবছরও বিশিষ্ট ঔপন্যাসিক, প্রাবন্ধিক ও লেখকদের লেখায় ভরে উঠবে স্বস্তিকার পূজা সংখ্যা।

।। দাম : ৫০.০০ টাকা।।

আপনার কত কপি প্রয়োজন সত্বর স্বস্তিকা কার্যালয়ে যোগাযোগ করে জানান।

সম্পাদকীয়

অলিম্পিকের মশাল

টোকিয়ো অলিম্পিকে ভারত অভাবনীয় সাফল্য লাভ করিয়াছে। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে অলিম্পিকে এহেন সাফল্য ভারত আর লাভ করে নাই। সাকুল্যে আজ অবধি দেশ ৩৫টি অলিম্পিক-মেডেল জয় করিয়াছে। তাহার মধ্যে একডজন মেডেল আসিয়াছে হকিতেই। ১৯২৮ হইতে ১৯৮০ সাল পর্যন্ত দ্বাদশটি অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে এগারোটিতেই হকিতে ভারতের পদকপ্রাপ্তি হইয়াছিল। স্বর্ণ জয়ের নিরিখেও হকির অবদান অবিস্মরণীয়। ১৯২৮ হইতে ১৯৫৬ পর্যন্ত টানা ছয়বার ভারত হকিতে স্বর্ণপদক লাভ করে। এবারের পরিসংখ্যান সকলেই জানেন। নতুন করিয়া বলিবার কিছুই নাই। তবে বিশেষভাবে গর্বিত হইবার কারণ ঘটিয়াছে, কারণ একক কৃতিত্বে দ্বিতীয়বারের ন্যায় এবারও অলিম্পিকে সোনা আসিয়াছে। জ্যাভলিন নিক্ষেপে নীরজ কুমার সোনা জিতিয়াছেন। এবং হকির গৌরবময় যুগের ঝিলিকও এবার দেখা গিয়াছে, দীর্ঘ চার দশকেরও বেশি সময় পার করিয়া ব্রোঞ্জ পদক জেতায়। সব মিলিয়ে অলিম্পিকে সাতটি পদক প্রাপ্তি, তাহার মধ্যে সোনা-সহ দুটি রুপা ও চারটি ব্রোঞ্জ আছে, নিঃসন্দেহে আশাতীত ভালো ফল। একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, ভারতে জনপ্রিয়তম ক্রীড়া ক্রিকেট। তাহার পরেই ফুটবলের স্থান। বাকি ক্রীড়াগুলির স্থান এই দুটি খেলার চেয়ে কয়েক যোজন পিছনে। শুধু চার বছর অন্তর অলিম্পিক আসিলে এই দুটি ক্রীড়া ব্যতীত আরও খেলা যে আছে, তাহা আমাদের মনে পড়ে। ফলত যা হইবার তাহাই হয়, বিশ্ব ক্রীড়ামঞ্চে আমরা মুখ কালো করিয়া ফিরি। ফুটবলেরও অবস্থা যদিও তথৈবচ। কিন্তু ইউরোপীয়, লাতিন আমেরিকার ফুটবলে আমরা মশগুল হইয়া বিশ্ব মানচিত্রে ভারতের দুরবস্থা আমরা ঢাকিয়া রাখিবার প্রয়াস করি মাত্র। ১৩৮ কোটি ভারতবাসীর ইহা দোষ নহে। ক্রীড়াপ্রেম ভারত ও ভারতবাসীর সম্পদ। ইহাকে সঠিক দিশা দেখানো প্রশাসনের কাজ।

এই দিশা দেখাতেই এতদিন ব্যর্থ হইয়াছেন আমাদের দেশের সরকার। আমাদের অপিম্পিক ব্যর্থতার তাহাও একটা বড়ো কারণ। কিন্তু বর্তমান সরকারের আমলে পরিস্থিতিটা পাল্টাইয়াছে। 'এক দেশ এক ক্রীড়া-নীতি' ঘোষিত হইয়াছে। আমাদের দেশের ক্রীড়া-পরিকাঠামো উন্নয়নে সরকার সদর্থক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহার প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল ২০২৮-এর অলিম্পিক। স্থানীয় অ্যাথলিট প্রতিভা খুঁজিয়া আনিবার লক্ষ্যে ইতিমধ্যেই সমস্ত রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে 'খেলো ইন্ডিয়া' রাজ্যস্তরীয় উৎকর্ষ কেন্দ্র স্থাপনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। এছাড়াও, স্থানীয় প্রতিভাবান অ্যাথলিটদের খুঁজিয়া বাহির করিতে এবং তাঁহাদের ক্রীড়া নৈপুণ্যকে আরও ক্ষুরধার করিয়া তুলিতে জেলাস্তরে এক হাজারটি 'খেলো ইন্ডিয়া' কেন্দ্র গড়িয়া তুলিবার সিদ্ধান্ত লওয়া হইয়াছে। এই কেন্দ্রগুলিতে ১৪টি ক্রীড়ার প্রশিক্ষণ দেওয়া হইবে। ইহার উদ্দেশ্য, এই উদ্যোগে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলিকে সক্রিয়ভাবে শামিল করিয়া সহযোগিতার ভিত্তিতে এমন এক ভবিষ্যৎ রূপরেখা চূড়ান্ত করা, যাহা ভারতকে অবিলম্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে মহাশক্তিধর দেশে পরিবর্তন করিতে পারে।

২০২৮-এর অলিম্পিকে ভারত যাহাতে প্রথম দশ দেশের মধ্যে স্থান লাভ করে তাহা প্রাথমিক লক্ষ্য হইলেও ইহার সুফল কিন্তু ২০২১-এই ফলতে শুরু করিয়া দিয়াছে। নীরজ চোপড়া, ভারতীয় হকি দল সমেত পিভি সিন্ধু, রবি দাহিয়া, লাভালীনা, মীরাবাই চানু, বজরং পুনিয়া ২০২১-এই আশার আলো জ্বালিলেন। অলিম্পিকের এই মশাল নিভিবে না, স্বপ্নের উড়ানের শুভ সূচনা হইলো বলিয়া আমরা আশাবাদী।

সুভাষিতম্

দ্বাবিমৌ পুরুষৌ লোকে স্বর্গস্যোপরিতিষ্ঠতঃ।

প্রভুশ্চ ক্ষময়া যুক্তো দরিদ্রশ্চ প্রদানবান্।।

জগতে দুই প্রকারের লোক আছেন, যাঁরা স্বর্গের চেয়েও উচ্চস্থান লাভ করেন। এক, যিনি ক্ষমতাবান ও সম্পন্ন হয়েও দয়ালু হন এবং দুই, যিনি নির্ধন হয়েও দান করেন।

এ কি মমতার মারণ খেলা?

নির্মাল্য মুখোপাধ্যায়

১৬ আগস্ট খেলা হবে বলে হুঙ্কার ছেড়েছেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কী সে খেলা বা কী ধরনের খেলা তা তিনি বলেননি। বলবেনই বা কেন? কিছু অর্থ গোপন রাখতে হয়। ভবিষ্যতে তা চোরাগোপ্তা কাজে ব্যবহারের জন্য। কুশলী রাজনীতির সেটাই ধর্ম। ৬ বারের সাংসদ আর ৩ বারের মুখ্যমন্ত্রী তা বিলক্ষণ জানেন।

১৬ আগস্ট ফুটবল প্রেমী দিবস। ১৯৮০-তে ফেড কাপে ইস্টবেঙ্গল-মোহনবাগান খেলায় গন্ডোগোলের জেরে ইডেন গার্ডেনে ১৬ জন ফুটবলপ্রেমী প্রাণ হারান। সেই স্মৃতি উস্কেই মমতার 'খেলা হবে'।

২ মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশের পর থেকে রাজ্যের বহু বিজেপি সমর্থক সে খেলা হাড়ে মজ্জাতে মালুম পেয়েছেন। তাদের উপর প্রায় ৮ হাজার আক্রমণ হয়েছে বলে অভিযোগ। কিন্তু মাত্র ১২১টি পুলিশি অভিযোগ জমা পড়েছে। জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আর কলকাতা হাইকোর্টকে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলতে হয়েছে 'হচ্ছেটা কি?' মমতা সরকারকে ভর্ৎসনা করে অত্যাচারিত আর ঘরছাড়াদের ঘরে ফেরানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। বিন্দুমাত্র না দমে মমতা খেলা চালিয়ে যাওয়ার প্রতিজ্ঞা করেছেন আর উচ্চ আদালতে আপিল করেছেন।

নির্বাচনের আগে 'খেলা হবে' আর 'বাংলার মেয়ে'-র স্লোগানে গা ভাসিয়ে মমতা ভোটে জেতেন। ধূলিসাৎ করতে না পারলেও আটকে দেন বিজেপির পরাক্রম। তবে তার ভোট কুশলী প্রশান্ত কিশোর অন রেকর্ড বলেছেন, 'হেরে গেলেও বঙ্গে বিজেপি লম্বা দৌড়ের ঘোড়া। তারা এখানে থাকতে এসেছে। চলে যেতে নয়'। ১৯৯৮-এ তৃণমূল দলের জন্মলগ্ন থেকে বিজেপির সাথে ঘর করে আসা মমতা তা ভালোভাবেই জানেন। ২০০৪-এ সে বাঁধন ছিঁড়ে যায়।

তাই তিনি খেলায় মেতেছেন। মমতার সে খেলা যে 'মারণ খেলা' বিজেপির ২ কোটি ২৮ লক্ষ ভোটার সমর্থক তা ইতিমধ্যে বুঝেছেন। মমতা ২০২৪-এর লোকসভা ভোটের দামামা বাজিয়ে দিয়েছেন। ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে বিজেপির বিরুদ্ধে মহাজোট গড়তে ব্যর্থ হয়ে মমতা এবার তেড়ে ফুঁড়ে নেমেছেন। সম্প্রতি বিধানসভা নির্বাচনের সাফল্য তাকে অনেকটাই আশাবাদী করে তুলেছে।

বিধানসভার নিরিখে বিজেপির সঙ্গে তার দলের ভোটের তফাত আনুমানিক ৬০ লক্ষ। অর্থাৎ প্রায় ৩০টি বিধানসভা কেন্দ্রের ব্যবধান। কিন্তু মমতা ২১৩টি কেন্দ্রে জেতেন। আর বিজেপি—৭৭। ১০টি কেন্দ্রে বিজেপির জমানত জব্দ হয়। এ ব্যাপারে কংগ্রেস বামপন্থী দলরা সবচেয়ে দুর্দশাগ্রস্ত। সিপিআই-সিপিএম ১৪৮ আসনে লড়ে ১২৯ টি আসনে জামানত জব্দ হয়। কংগ্রেসের ৯১টি আসনের ৭৯টিতে জামানত জব্দ হয়। কংগ্রেস—সিপিএম—এর কাছ থেকে মমতা ২৯ আর ২৫ মোট ৫৪টি আসন পান। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে 'এ তো দয়ার দান'। ২০১৬-র বিধানসভার ২০৯ আসনের মধ্যে মমতা এবার মাত্র ১৬০ আসন জেতেন।

কেন এই দয়া? নিছক বিজেপিকে ঠেকাতে। বিজেপি লড়ে ২৯১টি কেন্দ্রে। মমতা ২৮৮। ২০২১-এর বিধানসভা ভোটে তৃণমূল আনুমানিক ২ কোটি ৮৭ লক্ষ ভোট পায়।

হয়ত এই ফল মমতাকে নতুন ভাবে 'খেলা হবে'-তে উদ্বুদ্ধ করেছে। তার সেই খেলার আঁচ গ্রাম আর জেলা খানিকটা পেয়েছে। ২০১৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৩৫ শতাংশ মানুষকে জোর করে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। আদালত সে অভিযোগে আমল দেয়নি। কিন্তু ২০১৯-এর লোকসভার ভোটবাক্স মমতাকে হকচকিয়ে দেয়। ২০১৬ সালের ১০ শতাংশ ভোট পাওয়া বিজেপি লম্ফ দিয়ে ৪০ শতাংশে পৌঁছে যায়। বিজেপি ১৮টি আসন পায়। হয়তো সেটাই দলের কাল হয়। অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাসের ফলে ২০২১-এর বিধানসভা লড়াইয়ে পা পিছলে যায় বিজেপি-র। তারা ধরেই নিয়েছিল লড়াই জিতে গিয়েছে। সেখানে মস্ত ভুল। ২০১৯ লোকসভা ভোটে ১২১ আসনে এগিয়ে থেকেও ২০২১-এ মাত্র ৬৪ আসন বিজেপি ধরে রাখতে পারে। খোয়া যায় আনুমানিক ৭ শতাংশ হিন্দু ভোট। ২০১৯-এ বিজেপি ৫৭ শতাংশ হিন্দু ভোট পায়। ২০২১-এ তা হয় ৫০ শতাংশ।

এটা বাস্তব। আপাতত মমতা জয়ী। আর তাই 'খেলার' এত দাপট। তবে এ 'খেলা হবে' না 'খেলা শেষ হবে' আগামীতে তা বলবেন রাজ্যের ৫ কোটি ৬৫ লক্ষ ভোটদানকারী মানুষ। একটাই বাসনা সব খেলা চলুক। মমতা কেবল 'মারণ খেলাটা' বন্ধ করুন। একজন পোড় খাওয়া রাজনীতিকের কাছে এই সামান্য রাজধর্ম পালন আশা করা যেতেই পারে। অবশ্য সে রাজধর্মের অর্থ যদি তিনি বোঝেন বা উপলব্ধি করতে পারেন। ▫

হিন্দুত্বের বিনাশ চাই

মাননীয় কমরেডগণ,

কোন ঠিকানায় চিঠি পাঠাব জানি না।

'আমরা ২৩৫, ওরা ৪০।' বছর ১৫ আগে এমনটা বলেছিলেন বাম মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। কিন্তু আজ 'আমরা' বলার কেউ নেই। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা ভবন দেখল স্বাধীন ভারতের প্রথম কোনও সময় যেখানে একজনও 'আমি বাম' বলার মতো নেই। শুধু তাই নয়, 'আমি আছি' বলে হাত তুলতে পারলেন না কোনও কংগ্রেস বিধায়কও। হাত ধরাধরি করে ভোটে লড়া বাম ও কংগ্রেস দুই শিবিরেরই ঝুলি শূন্য। কংগ্রেসও এ রাজ্যে বিধানসভার ইতিহাসে প্রথমবার শূন্যস্থানে। বুদ্ধদেবের আগে এই বিধানসভা দেখেছে জ্যোতি বসুর দাপট। দেখেছে সুভাষ চক্রবর্তী, শ্যামল চক্রবর্তীদের। আবার বাম রেজ্জাক মোল্লাকে তৃণমূল হয়ে যেতেও দেখেছে। কিন্তু এমন শূন্যতা দেখেনি।

এ হেন পরিস্থিতিতে দলকে ঘুরে দাঁড়াতে হবে। আর বাঙ্গলায় দলকে ঘুরে দাঁড়াতে হলে হিন্দুত্ব বিরোধী প্রচার এবং আদর্শগত আন্দোলনের পথে হাঁটতে হবে। বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যস্ত আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের নেতাদের এমনই পরামর্শ দিয়েছে সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটি। ভোট পর্যালোচনার যে রিপোর্ট দলের কেন্দ্রীয় ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হয়েছে, তাতেই স্পষ্ট ভাষায় এমন নির্দেশের কথা বলা হয়েছে।

এই রাজ্যে বিজেপির উত্থানেই যে সিপিএম শূন্যে পৌঁছে গিয়েছে, তা বিধানসভা নির্বাচনের পরিসংখ্যানই বলে দিচ্ছে। রাজ্য বিধানসভায় বিজেপি তাদের সদস্যসংখ্যা ৩ থেকে বাড়িয়ে ৭৭ করেছে। সেখানে ২৬ থেকে শূন্যে নেমে গিয়েছে সিপিএম-সহ বামেরা। লোকসভা নির্বাচনের পরে বিধানসভা ভোটেও সিপিএমের ঝুলি শূন্য।

সেই শূন্য থেকে লড়াই শুরু করা যাবে কীভাবে, তা জানাতে গিয়ে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছে, প্রান্তিক মানুষদের সঙ্গে নিয়ে লড়াই করতে হবে। কাছে টানতে হবে দলিত,

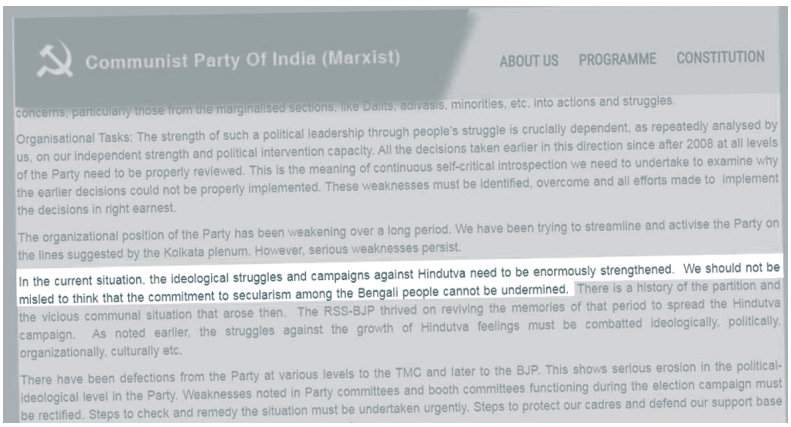
Communist Party Of India (Marxist)

ABOUT US PROGRAMME CONSTITUTION

concerns, particularly those from the marginalised sections, like Dalits, adivasis, minorities, etc. into actions and struggles.

Organisational Tasks: The strength of such a political leadership through people's struggle is crucially dependent, as repeatedly analysed by us, on our independent strength and political intervention capacity. All the decisions taken earlier in this direction since after 2008 at all levels of the Party need to be properly reviewed. This is the meaning of continuous self-critical introspection we need to undertake to examine why the earlier decisions could not be properly implemented. These weaknesses must be identified, overcome and all efforts made to implement the decisions in right earnest.

The organizational position of the Party has been weakening over a long period. We have been trying to streamline and activise the Party on the lines suggested by the Kolkata plenum. However, serious weaknesses persist.

In the current situation, the ideological struggles and campaigns against Hindutva need to be enormously strengthened. We should not be misled to think that the commitment to secularism among the Bengali people cannot be undermined. There is a history of the partition and the vicious communal situation that arose then. The RSS-BJP thrived on reviving the memories of that period to spread the Hindutva campaign. As noted earlier, the struggles against the growth of Hindutva feelings must be combatted ideologically, politically, organizationally, culturally etc.

There have been defections from the Party at various levels to the TMC and later to the BJP. This shows serious erosion in the political-ideological level in the Party. Weaknesses noted in Party committees and booth committees functioning during the election campaign must be rectified. Steps to check and remedy the situation must be undertaken urgently. Steps to protect our cadres and defend our support base

আদিবাসী ও সংখ্যালঘুদের। দলের সাংগঠনিক ভিত্তি আরও শক্তিশালী করতে হবে। কাটিয়ে উঠতে হবে যাবতীয় দুর্বলতা। সেই সঙ্গেই বলা হয়েছে, বর্তমান পরিস্থিতিতে হিন্দুত্ব বিরোধী প্রচারে জোর দেওয়া দরকার। একই সঙ্গে বলা হয়েছে, ধর্মনিরপেক্ষতা নিয়ে বাঙ্গলার মানুষের যে আবেগ হয়েছে, সেটাও মাথায় রাখতে হবে। বাঙ্গলায় দেশভাগ এবং তা থেকে অনেক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ইতিহাস রয়েছে। আরএসএস ও বিজেপি যৌথভাবে সেই সব স্মৃতি উসকে দিয়ে রাজ্যে হিন্দুত্বের পক্ষে প্রচার চালাচ্ছে। হিন্দুত্বের পক্ষে এমন আবেগ বেড়ে চলার জবাব দিতে পার্টিকে নীতিগত ভাবে, রাজনৈতিক ভাবে, সাংগঠনিক ও সাংস্কৃতিক ভাবে লড়াইয়ের পথ নিতে হবে।

জনগণ হাততালি দিন। দেশে ক্রমশ অস্তিত্বহীন হতে চলা সিপিএম কেন্দ্রীয় কমিটির হয়ে হাততালি দেওয়ার মতো কমরেড নেই। এক হাতে তো তালি বাজে না। তাই জনতাই ভরসা। কিন্তু হাততালি দেওয়ার মতো জনতাও কি রয়েছে আপনাদের সঙ্গে?

তাই একটা কথা বলি কমরেড। যে কথাটা আপনাদের নেতারা বলতে পারেননি। বাঙ্গলার ভোটকাব্যে সিপিএম এখন আর উপেক্ষিত নয়। আসলে সিপিএমের কাব্যটাই উপেক্ষিত। ফলে গায়ক বদল করেও গান হিট করানো যায়নি। পুরোনো মুখ বাতিল করে নতুন ও তরুণ মুখ আনা হয়েছিল। তরুণ ভোটব্যাঙ্কের দিকে লক্ষ্য রেখে দীপ্সিতা ধর, ঐশী ঘোষ এবং মীনাক্ষি মুখোপাধ্যায়ের মতো মুখকে ভোটে টিকিট দিয়েছিল সিপিএম। সকলেরই শোচনীয় হার হয়েছে। আরও বড়ো কথা, সাধারণ ভাবে সারা পৃথিবীতেই কমিউনিজমের ধ্যানধারণা অতীত। কোথাও কোথাও অস্তিত্ব থেকে গেলেও পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই কমিউনিজমকে খারিজ করেছে। যেমন ভারতেও কেরলে এখনও কমিউনিজম রয়েছে। সেখানকার সরকারও কমিউনিস্টদের। কিন্তু তা-ও কতদিন থাকবে, তা নিয়েও তর্ক উঠতে শুরু করেছে।

থাক, সে তর্ক। কমরেড ভুল করাটা আপনাদের অহংকার। সে ভুলকে ঐতিহাসিক বলাটা আপনাদের পরম্পরা। আর ভুল থেকে না শেখাটা আপনাদের ধর্ম। শুধু একটা কথা মনে করিয়ে দিই। হিন্দুত্ব এক আদর্শ। শত শত বছরের পরাধীনতা, শক, হুন, মোঘল, পাঠান থেকে ব্রিটিশ এবং সবশেষে কমিউনিস্টরা হিন্দুত্বের বিনাশ করতে চেয়েছে। কিন্তু পারেনি। বরং নিজেদের বিনাশ ডেকে এনেছে। আপনাদের ভবিষ্যৎ আপনারাই ঠিক করে নিন। শেষে আরও একটা কথা বলি, হিন্দুত্বের নতুন জাগরণ শুরু হয়েছে। আপনারা টের পাচ্ছেন কি। ভারত জগৎসভায় নতুন আসন পাতছে। খেয়াল করছেন কি। হিন্দুত্বের যে বিনাশ নেই তা ভেবে দেখেছেন কি! ভাবুন, ভাবুন, ভেবে দেখতে শিখুন। ◻

অতিথি কলম

এ. রঘুরাম রাজু

ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে গীতার গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা

শ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাণে অতীতের গৌরবশালী পথ প্রদর্শকদের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতের নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের কর্মধারাগুলি অঙ্গীভূত করতেও কোনো বাধা নেই।

আপাতভাবে মহামারী বিধ্বস্ত এই ভারতবর্ষে স্বাধীনতা অর্জনের ৭৫তম বর্ষ উদযাপনের নাম সর্ব ভারতীয় পরিপ্রেক্ষিতে 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' রাখাটা হয়তো একটু খাপছাড়া মনে হতে পারে। কিন্তু এই পটভূমিতেই যখন একটি সমস্যাদীর্ণ বর্তমান ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আমাদের সামনে উপস্থিত তখন অতীতের দিকে দৃষ্টিপাত করতে আমরা বাধ্য এবং যা খুব অনুচিতও না। এই সূত্রে ভারতের প্রাক্‌স্বাধীনতা পর্বের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের যে বিষয়গুলি চর্চার অন্তরালে রয়ে গেছে সেগুলি পুনরালোচনা ও বিশ্লেষণ করলে যে নির্যাস বেরিয়ে আসবে তা আমাদের এই বিপদকালীন পরিস্থিতি ও স্বাধীনতার গৌরবময় উদযাপনে নতুন পথনির্দেশ করতে পারে— পুনরুজ্জীবিত করতে পারে আমাদের উদ্দীপনাকে। এই প্রসঙ্গে TS Elliot-এর পঙক্তি আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রগুলিরই অনুরণন বলে মনে হয় 'Time present & time past are both perhaps present in the future... অতীত ও বর্তমান সময়ের প্রতিচ্ছবিই দেখা যায় ভবিষ্যৎ সময়ের আবর্তনে।

এই পাশ্চাত্য কবির দেশে জাতীয়তাবাদ আধুনিক ভাবনায় নিমজ্জিত থেকে অতীত থেকে কিছুই গ্রহণ করতে পারেনি। এমনকী সদ্য আধুনিক সময়ের অনতিপূর্বকালের অভিজ্ঞতাও তারা প্রয়োগ করেনি। সম্পূর্ণ বিপরীতভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদ তার প্রাচীন সমৃদ্ধ অতীতে প্রথিত। এর ফলে ভারত তার ইতিহাসের সঙ্গে যোগসূত্রটি সদা বজায় রেখেছে। এবং এই অতীতের কাল পরিধিটি অতি বিশাল।

একদিকে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাংখ্য দর্শনের ভাষ্য নিয়ে জাতির কাছে উপস্থিত তো বিবেকানন্দ প্রচার করছেন বেদান্তের সার সত্য। একই সঙ্গে আরও একটু পরবর্তী সময়ে পণ্ডিত বাবাসাহেব আম্বেদকর তুলে আনছেন কপিলা ও বুদ্ধদেবকে।

ভারতবর্ষের আকর গ্রন্থ মহাভারতের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ শ্রীমদ ভগবতগীতা দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছিল। গীতায় সংকলিত ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত হতবিহ্বল অর্জুনের উদ্দেশে দেওয়া অধর্মের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ক উদ্দীপনামূলক বক্তব্যকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিস্থাপন করেন বালগঙ্গাধর তিলক। লোকমান্য তিলক তাঁর' গীতা রহস্য' গ্রন্থে পাণ্ডব কৌরবের যুদ্ধের প্রেক্ষিতে ভারতবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে পাণ্ডব ও ব্রিটিশকে কৌরবের সঙ্গে প্রতিতুলনা করেন। এই মর্মে শ্রীকৃষ্ণ যেমন যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনকে হিংসার আশ্রয় নিতে উপদেশ দেন, তিলকও ইংরেজের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের ডাক দিয়ে গীতা প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

অতি প্রাচীন আকর গ্রন্থের নির্দেশাবলীকে অতীতের গর্ভ থেকে সন্ধান করে একেবারে স্বাধীনতার কালপর্বে প্রক্ষেপণ করে তিনি জাতিকে পরম্পরাগতভাবে অভিষ্ট পথে অনুপ্রাণিত করছিলেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য সভ্যতা কেবলমাত্র আধুনিক বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ও শিল্পায়নের ফসলগুলিকে ভবিষ্যৎ উন্নতির জন্য ব্যবহার করেছে। তাদের কার্যধারা অতীত নিরপেক্ষ। কিন্তু ইংরেজ এই নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার, শিল্প উন্নয়ন, সর্বাধুনিক প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল ভারতে তাদের উপনিবেশবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে, ভারতকে নানা পথে শোষণ করতে প্রয়োগ করেছিল। ভারতবাসীকে তারা তাদের যোগ্যতা মতো বর্তমান থেকে আহরণ করে নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্মাণের কোনো সুযোগ দেয়নি। এটিই ঔপনিবেশিক প্রভুর ধর্ম। এই বৈষম্য এবং বিভেদমূলক আচরণ তিলক ঠিক সময়ে ধরে ফেলেছিলেন। তিনি বুঝে ছিলেন কোন রাস্তাটি বন্ধ, কী পন্থা অবলম্বন করলে বিকল্প পথ খুলতে পারে। জাতি তার নিজের মতো চলতে পারে। পরবর্তীকালে গান্ধী তিলককে তাঁর গুরু মানলেও তিলকের অনুসৃত পথ

অর্থাৎ তিলকের গীতার ব্যাখ্যার সঙ্গে তাঁর ব্যাখ্যার যোজন পরিমাণ তফাৎ ছিল। তিলকের গীতাকে জাতীয় প্রেক্ষাপটে স্থাপনের দুটি ভাগ আছে। তিনি মহাভারত থেকে কেবলমাত্র গীতার অংশটিই বেছে নিয়েছিলেন, গোটা মহাভারত নয়। দ্বিতীয়ত গীতায় বিধৃত হিংসা প্রয়োগের ভাষ্যটি তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিলকের অনুগামী হয়ে আরও বহু জাতীয়তাবাদী স্বাধীনতা অর্জনে হিংসার পথ বেছে নিয়েছিলেন। আমার মনে হয় জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ মহাভারতের প্রাসঙ্গিক প্রয়োগ খুব বেশি নজরে পড়ে না। শ্রীঅরবিন্দের 'সাবিত্রী'কে সামগ্রিকতায় রাখা যায়। তাঁর গ্রন্থে যমের হাতে সাবিত্রীর স্বামীকে হারনোর সঙ্গে ইংরেজের হাতে ভারতের স্বাধীনতা হারানোর প্রাসঙ্গিকতা রয়েছে। শকুনিকে যেমন মহাভারতে শঠতম চরিত্র ও তার কার্যকলাপকে ধিক্কার জানানো হয় তেমনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদও একটি ক্রূরতম ভারত-শোষণযন্ত্র। গান্ধী এই গ্রন্থের মধ্য থেকে অহিংসাকে জাতীয় সংগ্রামের পথ করতে চেয়েছিলেন। পূর্ব বিষয়ে ফিরে বলতে হবে তিলক ও গান্ধীর মধ্যে মৌলিক ও চূড়ান্ত পার্থক্য ছিল গীতার ব্যাখ্যা নিয়ে। সকলেই জানেন উদাসীন অর্জুনকে ন্যায়যুদ্ধ বা ধর্মযুদ্ধ করতে তিনি কীভাবে হিংসার পথ অনুসরণ করতে রাজি করিয়েছিলেন। সেটিই গীতার নির্যাস। যা তিলকের অনুগামী হতে হাজার হাজার মানুষকে অনুপ্রাণিত করেছিল। গান্ধী এই অন্তর্লীন ধর্মযুদ্ধে হিংসার প্রয়োগকে সম্পূর্ণ বর্জন করে প্রায় নিজস্ব থিয়োরি তৈরি করে অহিংসাকে প্রশ্রয় দিয়েছিলেন।

তাঁর পদ্ধতি ছিল খণ্ডাংশ নয় সম্পূর্ণ থেকে বেছে নেওয়া। তার ফলে শুধু গীতা নয় গোটা মহাভারত খুঁজে তিনি অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। অতি প্রাচীনকাল থেকেই গীতা সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি ভাষ্য যা কোনো বৃহৎ গ্রন্থ থেকে প্রক্ষিপ্ত সেই হিসেবে বিবেচিত হয়নি। এটি নিজেই স্বয়ংসম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ বলে গৃহীত হয়েছে। গান্ধী উলটো পথে হেঁটে আক্ষরিক অর্থেই গীতাকে মহাভারতেরই অংশ ধরে অনড় ছিলেন। তিনি মহর্ষি বেদব্যাসের লিখনকে আদতে মহাভারতের সামগ্রিকতায় যুদ্ধের নিরর্থকতাই প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তাঁর বিশ্লেষণে মহাভারত রচিয়তারও ছিল সেই অভিপ্রায়।

বেদব্যাসের অন্যতম শিষ্য বৈশম্পায়ন অর্জুনপুত্র পরীক্ষিতের পুত্র জনমেজয়কে সর্পসূত্র যজ্ঞের সময় বোঝাচ্ছেন একটি মাত্র সর্পের ওপর ক্রোধবশত সমগ্র সর্পকুলকে বা সেই অর্থে কোনো জীবিতকেই হিংসার বশবর্তী হয়ে হত্যা করা বিধেয় নয়। কথাটি পরীক্ষিতকে চিন্তায় ফেলে দেয়। এই সূত্রে গান্ধীর লেখালিখির খুব নিবিড় অধ্যয়ন করলে দেখা যায় সমগ্রের এখান ওখান থেকে টুকরা টাকরা তুলে— মূল গ্রন্থ যে ধর্মযুদ্ধকে সর্বদা মান্যতা দিয়েছে তার বিপরীতে দাঁড়িয়ে মহাভারত অহিংসার জয়গান করেছে— এটাই তিনি খাড়া করতে চেয়েছেন। সক্রিয় রাজনীতিতে থাকায় তাঁর এই মূলত আংশিক এবং চরিত্রগতভাবে বৌদ্ধিক ব্যাখ্যাকে তিনি বিশ্বরাজনীতির প্রেক্ষাপটে স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অহিংসাকে তিনি অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করার কোনো প্রচেষ্টা বাদ দেননি যার জন্য সুবিধার্থে তিনি মহাভারতের নানা প্রক্ষিপ্ত অংশ বিশেষ নিয়েছিলেন গীতা নয়।

গোড়ায় বলার সময়ের অতীত, বর্তমান, ভবিষ্যতের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্লীন প্রবাহ বর্ণনায় ভারত ও পাশ্চাত্যের মূলগত ফারাক অর্থাৎ কেবলমাত্র বর্তমান নির্ভরতা ও ইতিহাস চেতনার কথা বলা হয়েছে। লোকমান্য তিলক অতীতের নির্দেশ মেনে গীতা নির্ভর হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নতুন রক্ত সঞ্চয় করে গেছেন। খুলে দিয়েছিলেন নতুন দিগন্ত।

বর্তমান ও অতীতের সঙ্গে ধারাবাহিকভাবে জড়িত থাকার এই ভারতীয় মডেল তাই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এটিকে সম্পূর্ণভাবে মেনে নিয়ে একমাত্র পথ হিসেবে গ্রহণ করা দরকার এমনও বলা হচ্ছে না। সময় গতিময়। 'আজাদী কা অমৃত মহোৎসব' উদযাপনের প্রতিজ্ঞা হিসেবে আমাদের ভবিষ্যতে জাতীয় জীবনের তৎকালীন ও সম্ভাব্য সমস্যা সমাধানে সময়োপযোগী ও সৃজনমূলক পথসন্ধান করতে কোনো বাধা নেই। শ্রেষ্ঠ সমাজ নির্মাণে অতীতের গৌরবশালী পথ প্রদর্শকদের সঙ্গে সাম্প্রতিক অতীতের নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তিদের কর্মধারাগুলি অঙ্গীভূত করতেও কোনো বাধা নেই।

(লেখক আইআইটি তিরুপতির অধ্যাপক)

আফগানিস্তানে তালিবান রাজ

সতর্কতা প্রয়োজন এরাজ্যেও

গত ১৫ আগস্ট গোটা দেশ যখন ৭৫তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে ব্যস্ত, তখন দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার কূটনীতিতে নিঃসন্দেহে তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ঘটে গেল। দীর্ঘ কুড়ি বছর বাদে আবার আফগানিস্তানের দখল নিল তালিবানেরা। তার আগে কয়েকদিন ধরেই আফগানিস্তানের একের পর এক এলাকা কোয়ালাত, তেরেনকোট, পুল-এ-আজম, ফেরোজ কোহ, কোয়ালা-এ-নাউ প্রভৃতি দখল করতে করতে অগ্রসর হচ্ছিল তালিবান সেনা। অথচ পরিস্থিতিটা কিন্তু একমাস আগেও এমন ছিল না। একের পর এক শহরে আফগান সেনার নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ হাতছাড়া হওয়াতে বোঝা যাচ্ছিল, যত সময় এগোচ্ছে তালিবানরা তত শক্তি সঞ্চয় করছে, এবং ১৪ আগস্ট চতুর্থ বৃহত্তম আফগান-শহর মারযার-এ-শরিফের পর কাবুলের পতন ছিল শুধু সময়ের অপেক্ষা। আফগান রাষ্ট্রপতি আশরাফ ঘনি দেশ ছেড়ে পালিয়েছেন। সম্ভবত, তাজিকিস্তানের দিকে গিয়েছেন। আফগান সরকারের আরও অনেক মন্ত্রীরা দেশ ছাড়ছেন। সব মিলিয়ে, সংবাদমাধ্যম সূত্রে যে খবর প্রকাশ্যে আসছে তাতে মধ্যযুগীয় পরিস্থিতি আবার ফিরল বলে। কাবুলের দখল নিতে না নিতে তালিবানরা মহিলাদের ওপর অত্যাচার শুরু করে দিয়েছে। তাদের যৌনদাসী বানানো, কেউ প্রতিবাদ করতে গেলে তাকে কচুকুটা করা শুরু হয়ে গেছে। শরিয়তি আইনও ইতিমধ্যেই চালু হয়ে গিয়েছে। ভারত-সহ বিদেশি রাষ্ট্রগুলো তাদের নাগরিকদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। ভারত সরকার এয়ার ইন্ডিয়ার বিশেষ বিমান পাঠিয়ে তাদের নাগরিকদের স্বদেশে ফেরানোর ব্যবস্থা করেছে। অন্যান্য দেশও এই বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নিচ্ছে। এখন প্রশ্ন, দীর্ঘ প্রায় কুড়ি বছর বাদে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব হলো কেন? সম্ভাব্য অনেক কারণ হতে পারে। কিন্তু সবচেয়ে জোরালো কারণ হলো আফগানিস্তান থেকে আমেরিকার সেনা প্রত্যাহার তালিবানদের বাড়তি অক্সিজেন জুগিয়েছে।

যাইহোক, একটি দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয় কিন্তু সারা বিশ্বের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে ওঠার জন্য যথেষ্ট। শুধু যে ইসলামীয় বর্বরতার ছবি আগামীতে দেখা যাবে তাই নয়, সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার শান্তি প্রক্রিয়াও বিঘ্নিত হবে। কারণ চীন-পাকিস্তান এই উগ্র ইসলামী শক্তির সাহায্য আগামীদিনে নেবে, ভারতের বিরুদ্ধে তা কাজে লাগানোর জন্য। পাঠকের মনে থাকতে পারে, ১৯৯৯-এর ডিসেম্বরে কান্দাহারে বিমান অপহরণ করে যাত্রীদের পণবন্দি রেখে তালিবানি জঙ্গিরা কুখ্যাত পাক-জঙ্গি ও জইশ-ই-মহম্মদের প্রতিষ্ঠাতা মাসুদ আজহারকে ভারতের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছিল। ভারত আপাতত এই গৃহযুদ্ধের মধ্যে নিজেকে জড়ানোর সিদ্ধান্ত না নিলেও, এ নিয়ে পাকিস্তানের ভূমিকার কড়া সমালোচনা করায় ভারতের মনোভাব বুঝেই তালিবানি হুমকির সম্মুখীন হয়েছে 'আফগান সেনাকে সাহায্য করলে ফল ভালো হবে না।' কিন্তু আফগানিস্তানের নির্বাচিত সরকারের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের সুসম্পর্ক। নরেন্দ্র মোদী ক্ষমতায় আসার পর দু'দেশের কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক অন্য মাত্রায় পৌঁছায়। সে দেশের পরিকাঠামো উন্নয়নে ভারতের বিপুল বিনিয়োগ রয়েছে, প্রায় ৫০০টি প্রকল্পের জন্য ভারত বিনিয়োগ করেছে ২২,০০০ কোটি টাকা। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, জারাঞ্জ থেকে দেলারাম পর্যন্ত ২১৮ কিলোমিটার সড়ক নির্মাণে বিনিয়োগ প্রায় হাজার কোটি টাকা। আফগান-ইরান সীমান্তে এই সড়ক নির্মাণের সামরিক-অর্থনৈতিক গুরুত্ব বিশাল।

হেরাতে সালমা বাঁছ তৈরিতে ভারতের লগ্নীর পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকা, আফগানিস্তানে নতুন সংসদ ভবন নির্মাণে ৬৭০ কোটি টাকা অর্থসাহায্য করেছিল ভারত। ২০১৫ সালে এই নতুন সংসদ ভবনের উদ্বোধন করেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। সেদিন এক ঐতিহাসিক ভাষণে তিনি বলেছিলেন, 'দু'দেশকে কাছাকাছি আনবে এই সংসদভবন'। আফগান সেনাকে ২৮৫টি সাঁজোয়া গাড়ি ও ওদেশের বায়ুসেনাকে দুটি হেলিকপ্টার এম আই-২৪ ও এম আই-৩৫ দিয়েছিল ভারত। ২০১৭ সালে সেদেশকে ভারতের অর্থসাহায্যের পরিমাণ ছিল ২০,০০০ কোটি টাকা। করোনাকালেও ৭৫,০০০ মেট্রিক টন গম, ১ লক্ষ প্যারাসিটামল ট্যাবলেট, ৬ লক্ষ হাইড্রোক্লোরোকুইন ট্যাবলেট দেওয়া হয়।

আপাতত যা পরিস্থিতি, তালিবানি হামলায় পরিকাঠামো উন্নয়নের কাজ প্রায় স্তব্ধ। ফলে ভারতের কূটনৈতিক-সামরিক কৌশলও যে আপাতত আর কার্যকরী হবে না তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং ভবিষ্যতে পরিস্থিতি কোন দিকে বাঁক নেবে তার দিকে কূটনীতিকরা সজাগ নজর অবশ্যই রাখবেন। তবে ভারত যেহেতু ঘরপোড়া গোরু, তাই আফগানিস্তানের সিঁদুরে মেঘ দেখে তাকে বাড়তি সতর্কতামূলক ব্যবস্থা রাখতেই হবে। বিদেশমন্ত্রী জয়শংকরের নেতৃত্বে ভারত ইতিমধ্যে এ ব্যাপারে তার কূটনৈতিক দৌত্যও শুরু করে দিয়েছে।

আমাদের ভয়টা অন্য জায়গায়। তালিবানদের আগমনে কিছু বাংলাদেশি ও এদেশীয় একটি বিশেষ ধর্মাবলম্বী গোঁড়া নাগরিকরা যারপরনাই খুশি হয়েছে এবং সোশ্যাল মিডিয়ায় ১৫ আগস্টের দিন সেই খুশি যেন উপচে পড়েছে। এখানেই আমাদের সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি। কারণ শুধু সমর্থনেই ব্যাপারটির সমাপ্তি ঘটবে, এত সরলীকরণ বোধহয় উচিত হবে না। জঙ্গিরা যে পশ্চিমবঙ্গ থেকে তাদের রিসোর্স খোঁজে আজ তা পরিষ্কার। সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল সব জেনেবুঝেও মুখে টুঁ শব্দটি করে না। তাই এই রাজ্যের বাসিন্দা হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য রয়েছে। এই সচেতনতাই আজ সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যের মূলে রয়েছে দায়বদ্ধতা

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

৭ আগস্টের ভারতীয় সময় ৪.৫০ মিনিটে যখন রাজপুতানা রেজিমেন্টের সুবেদার ২৩ বছরের সুঠাম তরুণ নীরজ চোপড়ার জ্যাভেলিনটি জাপান ন্যাশনাল স্টেডিয়ামের বায়ুস্তর বিদীর্ণ করে ৮৭.৫৮ মিটার উড়ে গেল, প্রায় ৬ হাজার কিলোমিটার দূরের ১৩৫ কোটি ভারতবাসীর উদ্বিগ্ন হৃদয়কেও তা আরপার করে দিল। রক্তক্ষরণের বদলে শুরু হলো এক দীর্ঘস্থায়ী সুখবৃষ্টি। হওয়াটা স্বাভাবিক। যুগ যুগ ধরে অবরুদ্ধ আবেগ তখন বহমান। ২০০৮ সালের বেজিং অলিম্পিকে অভিনব বিন্দ্রা ১০ মিটার air rifle shooting-এ ভারতের হয়ে প্রথম ব্যক্তিগত সোনা অবশ্যই জিতে ছিলেন। ব্যক্তিগত ইভেন্টে সর্বোচ্চ বিজয়ীর প্রথম গৌরব তাঁরই।

কিন্তু অলিম্পিক ইতিহাস (Modern Olympic 1814) পর্যালোচনা করলে দেখা যায় সেই শুরুর সুপ্রাচীন লগ্নে গ্রিসের এলিস গ্রামে খ্রিস্টপূর্ব ৭৭৬ সালে Olympia Temple of Zens-এর ভূমিতে যখন এর প্রথম সূচনা হলো তখন আজকের অলিম্পিকে যত সংখ্যক বিভাগ ও উপবিভাগ যেমন ফুটলবল, হ্যান্ডবল, ভলিবল, ওয়াটার পোলো— শুধু বল নিয়েই কত রকম খেলা, সেসব ছিল না। শুরুর পর্ব ছিল কেবলমাত্র atheletes-দের নিয়ে। হকি, ওয়াটার পোলো, বক্সিং বা জুডো ইত্যাদি দলবদ্ধ বা পারস্পরিক যুদ্ধ প্রকৃতির ক্রীড়াও সেখানে ছিল না। কিন্তু শটপাট বা জ্যাভলিন নিক্ষেপ ২৮০০ বছর আগেও বিশেষ কৌলিন্যের দাবি করত। Javelin throw তো আদতে বর্শা ছোঁড়া— এই খেলার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা চিরকালই আলাদা। গ্রিক গ্ল্যাডিয়েটররা এই খেলায় ছিলেন কুশলী।

সেই অর্থে নীরজের জয় সমগ্র ভারতের কাছে এক অর্থে 'মারি তো গণ্ডার লুটি তো ভাণ্ডারের' তকমা পেতেই পারে। ২০২০-র বিশিষ্টতা ছিল অন্য। নানা দিক দিয়ে বিশাল এই উপমহাদেশ থেকে যে ১২১ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশ নিয়েছিলেন তার মাধ্যমে ভেঙে গিয়েছিল অনেক দেওয়াল। উচ্চ-নিচ, জাত-পাত, ধর্ম, অর্থের বাধ্যবাধকতা। মহিলা হকি দলের এক বীরাঙ্গনা দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে

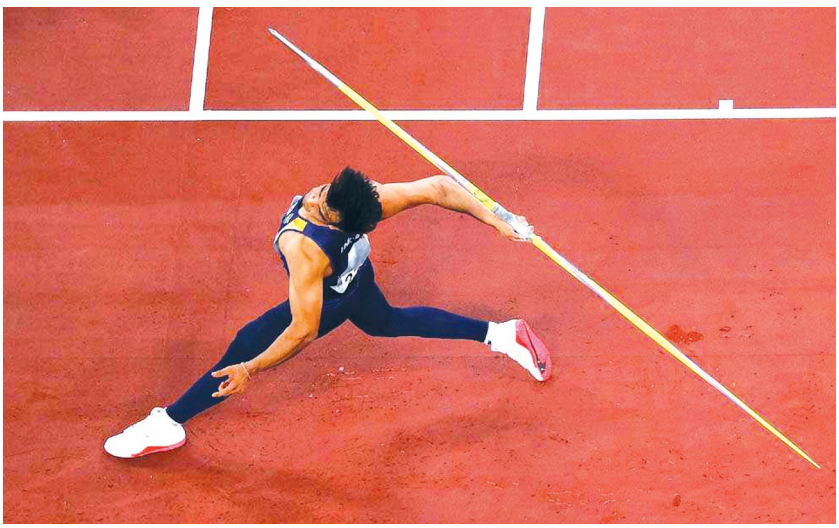

সর্বকালীন অলিম্পিক রেকর্ড করে হ্যাটট্রিক করেছিলেন। তাঁকে আজ উত্তরাখণ্ডের খেলার Brand ambassador করা হয়েছে। একটি অলিম্পিকে ১২১ জন প্রতিনিধি নিয়ে ৭টি পদক হয়তো খুব বেশি নয়। যেখানে আমেরিকা ১১৩, চীন ৮৮ বা আয়োজক দেশ জাপান ৪৮টি পদক জিতেছে। কিন্তু নিষ্ঠা বা নিজেকে উজাড় করে ছাপিয়ে যাওয়ার যে বিরল প্রচেষ্টা ভারতীয় ক্রীড়াবিদরা টোকিয়োর মাঠে ময়দানে রেখে এসেছেন তা আজ সমগ্র জাতিকে জাগিয়ে দিয়েছে। পর পর তিনটি ম্যাচে অলিম্পিকের মতো মঞ্চে পরাজিত হওয়ার পর পরের তিনটি ম্যাচ একনাগাড়ে জেতা মুখের কথা নয়। বাজি রেখে বলতে পারি অস্ট্রেলিয়ার সমর্থকেরা দুরাগত স্বপ্নেও কখনও ভাবেনি ভারতীয় মেয়েদের কাছে তারা কোয়ার্টার ফাইনালে ১ গোলে পিছিয়ে থেকে গোটা খেলায় তা শোধ করতে না পেরে হেরে গেছে। সেদিন বহু অস্ট্রেলিয় মেয়েদের হাউ হাউ করে কাঁদতে দেখা যায়। ভারতের সনাতনি সংস্কৃতির প্রমাণ রেখে শর্মিলা, রানিরাম পাল, গুরজিত, বন্দনারা তাদের সান্ত্বনা দেয়। এই সমগ্র পর্বটি ভারতীয় হকির ইতিহাসে এক সূর্যকরোজ্জ্বল অধ্যায়। তারা ২০১৬-র সোনা জেতা ব্রিটেনের কাছে ০-২-এ পিছিয়ে থেকেও ৩-২-এ এগিয়ে যায়। শেষ ফলাফল ৪-৩-এ হার।

এই যে টানাপোড়েন, দাঁতে দাঁত চেপে প্রাণপণ লড়াই দেওয়া তা একটি দেশের প্রতিনিধিত্ব করা খেলোয়াড়দের দায়বদ্ধতা ও জাতির পুনুরুত্থানেরই এক অবিতর্কিত দলিল। ব্রোঞ্জ জেতা পুরুষ হকির ক্ষেত্রেও একই কথা বলব। ব্রোঞ্জ নির্ধারণ ম্যাচে

হয়তো মেয়েদের হারের বদলা নিলেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানিকে পিছিয়ে থেকেও সমতা ফিরিয়ে শেষমেশ ৫-৪-এ জয় হাসিল করে। এগুলি লেখা সোজা। হকিতে পেনালটি কর্নার থেকে মারা কয়েকশো মাইল তীব্র গতিতে গোলমুখী ছুটে আসা বলকে সমগ্র শরীর দিয়ে ঠেকানো অসমসাহসিক কাজ। দেশের প্রতি তাদের যে দায়বদ্ধতা তা পদে পদে প্রমাণ করতে হয়। যে জন্য খেলায় ১টি পেনালটি কর্নার থেকে ৫টি বাড়তি পেনালটি কর্নার ওই শরীরকে বর্ম করার কারণেই বিপক্ষ দল পেয়ে যায়।

শুরুর প্রথম দিনের অলিম্পিক প্রতিযোগিতার ইতিহাসে পাওয়া যায় Corobbus নামে এক গ্রিক পাচক মঞ্চ থেকে ২০০ মিটার ছুটে প্রথম পদক জিতেছিলেন। সে রাজপুরুষ কিনা ৩০০০ বছর আগেও বিবেচিত হয়নি। টোকিয়োতে হ্যাট্রিক করা উপজাতি সম্প্রদায়ের গরিব বন্দনা বাবার কেটে দেওয়া বাঁশ দিয়ে হকি খেলেছে। জেদ ছাড়েনি। আমাদের দেশের মানুষের মধ্যে এই জেদের বীজই রোপিত হচ্ছে।

আর একটি প্রাচীন খেলা দেখুন। Shot put সেই রোমান আমলের। সেখানে আমাদের বীর কন্যা ১৯ বছরের কমলপ্রীত কাউর প্রাথমিক রাউন্ডে ৬৪ মিটার ছুঁড়ে নির্ধারিত মানদণ্ড পেরিয়ে সরাসরি ফাইনালে পৌঁছে যান। চূড়ান্ত Shot put নিক্ষেপে তিনি ষষ্ঠস্থান পান, এগুলি বড়ো কথা নয়। সর্বোচ্চ আন্তর্জাতিক আঙিনায় এমন নির্ভয়ে বুক চিতিয়ে লড়াই করতে আগে কখনও ভারতকে কেউ দেখেছে কিনা জানা নেই। এই সূত্রে হকিতে ৮০ সালের মস্কো অলিম্পিকে সোনা জেতাকে কোনো অংশে খাটো না করেও বলা যায়, সে বছর আফগানিস্তান যুদ্ধে রাশিয়া অংশ নেওয়ায় মার্কিন-সহ অন্য ৬৫টি দেশ খেলায় রাজনীতি যুক্ত করে অংশগ্রহণ করেনি। ভারত হকিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিল মাত্র ৬টি দেশের সঙ্গে। নিশ্চিত ভাবেই প্রতিযোগিতা কিছুটা দুর্বল ছিল। পরের বছর রাশিয়া cold war চালিয়ে লস অ্যাঞ্জেলেস অলিম্পিক বয়কট করে। এই রাজনীতির প্রসঙ্গে বলার আগে একটি কথা বলব। এই বাঙ্গলা থেকেও প্রতিযোগীরা বিভিন্ন বিভাগে একসময় যোগ দিত। ভারত্তোলনে হাওড়ার লক্ষ্মীকান্ত দাস, সাঁতারে হাওড়ার শচীন সেন, হকিতে কলকাতার গুরুবক্স সিং প্রমুখের কথা বলা যায়, ফুটবল তো ছিলই। ক্রীড়াবিদদের যথাযথ খেলার সুযোগ ও প্রশিক্ষণ একান্তই জরুরি। রাজনীতিবিদ হয়েও কোনো সুযোগ না নিয়ে হকি খেলোয়াড়দের উচ্চমানে পৌঁছতে নিরলস চেষ্টা করেছেন ওড়িশার মুখ্যমন্ত্রী নবীন পট্টনায়ক। ভুবনেশ্বরে বিশ্বকাপ হকির আয়োজক এমনই। তবে হ্যাঁ, হকি প্রশাসনের মাথায় তিনি বসিয়েছেন ওড়িশারই সন্তান পূর্বতন ভারতীয় হকি দিগগজ দিলীপ টিরকেকে। এবারের খেলায় তারই প্রতিফলন। গুরুবক্স সিং (মস্কো অলিম্পিকের সোনাজয়ী দলের প্রতিনিধি)-এর রাজ্যের Bengal Hockey Faderation প্রধান স্বপন ওরফে বুবুন ব্যানার্জি হয়তো ড্যাঙগুলি ছাড়া কিছু খেলেননি। হ্যাঁ, বলা দরকার দেশের প্রত্যেক প্রদেশে যেমন অলিম্পিক কর্তা নিয়োজিত হন, এখানে সেই পদ অলংকৃত করছেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়। এঁরা পরস্পর সম্পর্কিত। তাহলেই পরিষ্কার হবে বাঙলার ক্রীড়ামানচিত্র। পদকের কথা তো মনে থাকবেই কিন্তু পুরুষদের ৪×৪০০ মিটার রিলেতে নোয়া নির্মল টম, আরোকিয়া রাজীব, আমোজ জ্যাকব, মহম্মদ আনস ইয়াহিয়া সবধর্ম সমন্বয় করে চুপিসারে ভেঙে দিয়েছেন এশিয়ান রেকর্ড। তাঁদের ৪৫.৬৭ সেকেন্ডের দৌড় কয়েক চুলের জন্য তাঁদের ফাইনালে পৌঁছে দেয়নি। টোকিয়োর দূর প্রান্তরে প্রায় অজ্ঞাতসারে লড়ে শেষ দিনে ভারতবাসীর হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে দিয়ে ছিলেন এ যাবৎ অনালোচিত গলফার অদিতি অশোক। মাত্র এক পয়েন্টের জন্য তিনি ব্রোঞ্জ হারিয়েছেন। কিন্তু এরা সকলেই সঞ্চারিত করে গেছেন এক অনাস্বাদিতপূর্ব জাতীয়তাবোধ। অনুপ্রাণিত করে দিয়েছেন গোটা দেশকে। জ্বালিয়ে দিয়েছেন আশার দীপশিখা যা নিশ্চিত ভাস্বর হয়ে উঠবে আগামী প্রতিযোগিতাগুলিতে। তবে হ্যাঁ, যথাযথ প্রশিক্ষণ, সরকারি সহযোগিতা জরুরি (যেমন নীরজকে দেওয়া হয়েছিল। বিদেশমন্ত্রীকে ধরে কিরণ রিজু করোনা কালে তাকে বিশেষ ব্যবস্থায় সুইডেন অনুশীলন করতে পাঠিয়ে ছিলেন। একই সঙ্গে ওড়িশার মতো নির্দিষ্ট খেলা বোঝা মানুষদের সেই ক্রীড়া সংগঠনের মাথায় বসাতে হবে) তাহলেই ফল মিলবে। একই সঙ্গে সময়োপযোগী সাপোর্ট যেমন প্রধানমন্ত্রী প্রতিটি সাফল্যের পরই এমনকী মেয়েদের হারের পরও নিজে তাদের বাহবা দিয়েছেন প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন, ভারতের ক্রীড়া ভাণ্ডার ভরে দেওয়ার এগুলিই সঠিক রাস্তা। কেননা দায়বদ্ধতার প্রমাণগুলি ভারতের অলিম্পিক কর্মকাণ্ডের পরতে পরতে ছড়িয়ে রয়েছে। ১৮৯৪ সালে যে আপ্তবাক্য— olyempic is restored for peaceful international contention for excellence দেওয়া হয়েছিল তাকে ধরে রাখার দায় আমাদেরও রয়েছে।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক)

With Best Compliments from-

A

Well

Wisher

খেলো ইন্ডিয়ার সিঁড়ি ভেঙে অলিম্পিকের পোডিয়ামে

নিখিল চিত্রকর

সাইখোম মীরাবাই চানু, পিভি সিন্ধু, নীরজ চোপড়া, বজরঙ্গ পুনিয়া, রবিকুমার দাহিয়া, লাভলিনা বরগোঁঞাই, মনপ্রীত সিংহ এগুলো শুধু নাম নয়। এরা সবাই অলিম্পিক মহাকাশের এক একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র। এই নক্ষত্ররা তাঁদের স্বতন্ত্র আলোয় আলোকিত করেছে ভারতের অলিম্পিক পদকজয়ের ইতিহাস। শতাব্দীসেরা পারফর্ম্যান্সে ভেঙে দিয়েছে সর্বকালের রেকর্ড। স্বাধীনতার পঁচাত্তর বছরের বর্ষপূর্তিতে দেশকে বিশ্বজয়ের আস্বাদ দিয়েছেন বীরেন্দ্র, দিলপ্রীত সিংহরা। টোয়েন্টি-টোয়েন্টি অলিম্পিকে ভারতের এই সাফল্য বাস্তবায়নের রাজপথ তৈরি হয়েছিল সেদিন, যেদিন খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের অধীনে খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমসের উদ্বোধন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ২০১৮ সালের ৩১ জানুয়ারি দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী এরিনায় ভারতের চিরায়ত গুরু-শিষ্য পরম্পরার আদর্শে সূচনা হয় খেলো ইন্ডিয়ার মহাযজ্ঞের। মূলত টোকিও অলিম্পিকের লক্ষ্যেই ভারত সরকারের উদ্যোগে শুরু হয় খেলো ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগশিপ প্রকল্পটি।

ভারতীয় দল এযাবৎকালে সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদর্শন করে একটি সোনা, দুটি রুপো ও চারটি ব্রোঞ্জ-সহ মোট সাতটি পদক জিতেছে। ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডের ব্যক্তিগত ইভেন্টে ভারতীয় হিসেবে সোনা জিতেছেন নীরজ চোপড়া। স্বাধীনতার পর এই প্রথম কোনও ভারতীয় ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে পদক পেল। এর আগে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে ব্রিটিশ ভারতের প্রতিনিধি হিসেবে প্রথমবার পদক এনেছিলেন নরম্যান প্রিচার্ড। সেই ১২১ বছরের খরা কাটিয়ে স্বাধীন ভারতকে সোনা এনে দিলেন নীরজ। পিভি সিন্ধু ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ পদক জয় করে শুধু ভারতের নারী শক্তিকে দৃঢ় করেছেন তাই নয়, খেলোয়াড় জীবনে দুটি অলিম্পিক্স পদক জেতার কৃতিত্বও অর্জন করলেন। ২০১৬ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক্সে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন সিন্ধু। তিনিই একমাত্র ভারতীয় মহিলা যিনি দুটো অলিম্পিক পদক জয়ের ইতিহাস রচনা করেছেন। ভারত্তোলনে সাইখোম মীরাবাঈ

চানু এবং কুস্তিগীর রবিকুমার দাহিয়া দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে রুপোজয়ী হয়েছেন। দীর্ঘ একচল্লিশ বছর পর অলিম্পিক্স ভিলেজ থেকে পদক নিয়ে ফিরেছে ভারতীয় পুরুষ হকি দল। জার্মানিকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয়ী মনপ্রীতরা।

১৯৮০ সালে শেষবার সোনা জিতেছিল ভারতীয় হকি দল। তারপর ২০২০-তে এসে এই ঐতিহাসিক জয় কুস্তিতে। বজরঙ্গ পুনিয়া ও বক্সিংয়ে লাভলিনা বোরগোঞাইঁ ব্রোঞ্জ জিতে আরও দীর্ঘ করেছেন ভারতের পদক তালিকা। ভারতের মহিলা হকি দলও দীর্ঘ ৪১ বছর পর চতুর্থ স্থান অর্জন করেছে। পদক পাননি তাঁরা, তবে তাঁদের হার না মানা মনোভাব মন জিতে নিয়েছে ১৩০ কোটি ভারতবাসীর। এই সাফল্য ঐতিহাসিক। বহু শ্রম, বহু পরিকল্পনায় মোড়া এই সাফল্য কাঙ্ক্ষিত ছিল। টোকিয়ো অলিম্পিকে প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় অ্যাথলিটদের উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে এমনটাই জানিয়েছিলেন ভারতীয় জিমন্যাস্ট দীপা কর্মকার। ১৭ জুলাই ২০২১-এ তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের রিজিওনাল আউটরিচ ব্যুরো আয়োজিত 'অলিম্পিক্সে ভারত' শীর্ষক একটি ওয়েব আলোচনায় দীপা সেদিন বলেছিলেন, ভিশন টোয়েন্টি-টোয়েন্টি অলিম্পিক্স নিয়ে ভারত সরকার যেসব উদ্যোগ নিয়েছে, তা প্রশংসনীয়। যোগ্যতা সম্পন্ন অ্যাথলিটদের প্রশিক্ষণ দিয়ে যেভাবে অলিম্পিক্সের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে, তার ফলে টিম ভারতের প্রচুর পদক পাওয়ায় সম্ভাবনা উজ্জ্বল হয়েছে। যদিও চোট পাওয়ার জন্য এবারের অলিম্পিক্সে অংশ নিতে পারেননি দীপা। কিন্তু ২০১৬ রিও অলিম্পিকে সাড়া জাগানো এই জিমন্যাস্ট অলিম্পিক্স নিয়ে ভারত সরকারের উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছিলেন।

টোকিয়ো অলিম্পিক্সে অংশ নেওয়া ১২১ জন ক্রীড়াবিদের মধ্যে অধিকাংশই খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের সাহচর্য্য পেয়েছেন। ২০১৮-য় খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের উদ্বোধনের পর ধাপে ধাপে এর পরিধি বাড়ানো হয়। ২০১৯-এ খেলো ইন্ডিয়া স্কুল গেমসের নাম পরিবর্তিত করে রাখা হয় খেলো ইন্ডিয়া ইয়ুথ গেমস। ততদিনে ভারতীয় অলিম্পিক্স অ্যাসোসিয়েশনকেও খেলো ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগশিপ প্রোজেক্টের বৃহৎ কর্মযজ্ঞে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। দেশের অলিতে-গলিতে খেলো ইন্ডিয়ার বার্তা পৌঁছে দিতে ডিজিটাল ইন্ডিয়ার বৃহত্তর সোপানের আঙ্গিকে প্রকাশ করা হয় খেলো ইন্ডিয়া অ্যাপ। ২৭ ফেব্রুয়ারি ২০১৯-এ নয়া দিল্লির বিজ্ঞান ভবনের ইয়ুথ ইন্ডিয়া পার্লামেন্টে স্পোর্ট অ্যান্ড ফিটনেস সংক্রান্ত খেলো ইন্ডিয়া অ্যাপটির উদ্বোধন করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, 'বিগত কয়েক বছরে খেলায় অভূতপূর্ব উন্নতি করেছে ভারত। আমাদের ক্রীড়াবিদদের এই কৃতিত্ব এবার বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার সময় এসেছে। আমাদের দেশের তরুণ প্রজন্মকে খেলাধুলায় অংশগ্রহণের জন্য একটি দৃঢ় মনোভাব তৈরি করতে হবে যা খেলোয়াড়দের সেরা প্রদর্শন করতে প্রেরণা জোগাবে। সেদিনই ভারতের স্পোর্টস সুপার পাওয়ার হওয়ার স্বপ্ন পূরণ হবে'। খেলো ইন্ডিয়া ফ্ল্যাগশিপ প্রোজেক্ট সেই গ্লোবাল প্ল্যাটফর্ম ক্র্যাক করার প্রথম সোপান। সেই লক্ষ্যমাত্রা সামনে রেখেই একেবারে তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা তুলে আনতে শক্তিশালী পরিকাঠামো নির্মাণ করা হয়েছে। সংগঠিত হয়েছে উচ্চ পর্যায়ের কমিটি।

যারা সারা ভারত ঘুরে শুধুমাত্র প্রতিভার নিরিখেই খেলোয়াড় নির্বাচন করবে। বাস্তবে হয়েছেও তাই। জ্যাভেলিন থ্রোয়ার নভদীপ সিংহ, শাটলার পালক কোহলি এমন দুটি নাম যারা খেলো ইন্ডিয়ার মাধ্যমে তস্য গ্রাম থেকে উঠে এসেছেন এবং টোকিয়োয় আগামী ২৪ আগস্ট থেকে অনুষ্ঠিতব্য প্যারাঅলিম্পিক্সে অংশগ্রহণের যোগ্যতা অর্জন করেছেন। ২০১৮ আগে কেউ তাঁদের নাম শোনেনি। এই প্রকল্প থেকে দশ হাজার অ্যাথলিটকে মাসিক ৩০০০ টাকা করে হাত খরচ দেওয়া হয়, যার ফলে খেলোয়াড়রা তাঁদের প্রশিক্ষণে সম্পূর্ণ মনোনিবেশ করতে পারে।

অতীতে বিভিন্ন প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণের ঘটনা সামনে এসেছে। বিভিন্ন জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় বহু যোগ্য খেলোয়াড় সুযোগ না পাওয়ার ঘটনাও সামনে এসেছে। সেই সময় ঘৃণ্য রাজনীতির শিকার হয়ে অনেক খেলোয়াড়ের কেরিয়ার শেষ হয়েছে। অথচ খেলার জগতের রাজনীতি, কোচদের একাধিপত্য শেষ করতে বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখায়নি সরকার। কেন্দ্রে রদবদলের পর সেই অন্ধকার ক্রমশ কাটছে। বিভিন্ন সময় ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়ে খেলার জগতকে স্বচ্ছ রাখার সিদ্ধান্তে অটল মোদী সরকার। তাই আজ ভারতে যে কোনো প্রতিযোগিতায় যোগ্যতার একটাই মাপকাঠি— প্রতিভা। এর আগে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও ক্রীড়াজগতকে সুশৃঙ্খল পরিকাঠামোয় বাঁধতে চেয়েছিলেন। তাঁর সময়েই ডিডি স্পোর্টস চ্যানেলটির উদ্বোধন হয়। মিশন টোকিয়ো অলিম্পিক্সের লক্ষ্যে ভারত সরকারের অন্যতম প্রয়াস ছিল টার্গেট অলিম্পিক্স পোডিয়াম স্কিম বা টপস। ভারতের সেরা প্রতিভাবান ক্রীড়াবিদদের সহযোগিতার লক্ষ্যেই এই কর্মসূচি গ্রহণ করেছে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রক। এই কর্মসূচির মাধ্যমে অলিম্পিক পদক মঞ্চে যাতে ভারতীয় অ্যাথলিটরা জায়গা করে নিতে পারেন তার জন্য উচ্চ পর্যায়ের প্রশিক্ষণ, ট্রেনিং কোচ নিয়োগ থেকে শুরু করে যাবতীয় সাহায্য করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে প্রতিযোগিতা করার মতো পরিকাঠামো প্রদান করা হয়েছে অ্যাথলিটদের। ৫০টিরও বেশি আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়া তিরন্দাজ দোলা ব্যানার্জি টোকিয়োয় ভারতের এই সাফল্যের জন্য ভারত সরকারকে কৃতিত্ব দিয়েছেন। তাঁর কথায় সম্প্রতি ভারতীয় অ্যাথলিটদের তুলে আনার জন্য এই সরকার যে আন্তর্জাতিক মানের পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে, তা পরবর্তী দুটো অলিম্পিক্সে ভারতকে আরও বেশি সংখ্যায় পদক জয়ে সাহায্য করবে। এখনই ২৫০ জন প্রতিযোগীকে বেছে নেওয়া হয়েছে ২০২৪ প্যারিস অলিম্পিক্সের জন্য। এবং তাদের প্রশিক্ষণ চলছে জোর কদমে। সেই সঙ্গে 'ফিট ইন্ডিয়া' অভিযানকেও সমান কৃতিত্ব দিতে হবে।

২০১৯-এ ক্রীড়াবিদসে রেডিয়োয় মন কি বাত অনুষ্ঠানে ফিট ইন্ডিয়া অভিযানের কথা বলেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেছিলেন, সুস্থ ভারত গড়তে গেলে সবার আগে চাই ফিটনেস। সাফল্যের কোনও মসৃণ পথ হয় না, সিঁড়ি ভাঙতেই হবে।

ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব

তৃণমূলের নাটকে ত্রিপুরার দুয়ো

বিশ্বপ্রিয় দাস

রাজ্যের শাসক দলের কি মতিভ্রম হয়েছে? নাকি দিবাস্বপ্নে বিভোর? নয়তো নিজেদের নিজেরা চিনতে পারছেন না? পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা তৃণমূল পেলেও রাজ্যের সুপ্রিমো নিজে হেরে গিয়েছেন, তা সত্ত্বেও তিনি কি মুখ্যমন্ত্রী পদ আঁকড়ে থেকে একেবারে দেশের সর্বোচ্চ পদটি পাবার জন্য আরেক স্বপ্নে ভাসছেন? এই প্রশ্ন উঠছে একটিই কারণে, সেটি আর কিছুই নয়, তিনি ২০২৩-এর ত্রিপুরার বিধানসভা নির্বাচনকে মাথায় রেখে ত্রিপুরায় নিজের দলবলকে ঝাঁপিয়ে পড়তে বলেছেন। কেন এই ঝাঁপিয়ে পড়া? তার কারণ ওনার মনে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বাঙ্গালি আর ত্রিপুরার বাঙ্গালিরা চরিত্রগত দিক দিয়ে হয়তো এক।

রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস কেন এই ত্রিপুরার নির্বাচনকে নিয়ে এত মাথা ভারী করে ফেলল? প্রথমেই সে লক্ষ্যে নজর দেওয়া যাক। এক সময় ত্রিপুরায় সংগঠনকে সাজাবার জন্য দলবদলু মুকুল রায়কে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। তার হাত ধরে বেশ কিছু নেতা নেত্রী বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে যোগ দিয়েছিলেন। হাতে এসেছিল কয়েকটি পঞ্চায়েত। কিন্তু বিষয়টা ওখানেই থেমে যায়। পরবর্তীতে ত্রিপুরার সাধারণ মানুষ পশ্চিমবঙ্গের দলটিকে বিশ্বাস করা দূরে থাক, একেবারে ছুঁড়ে ফেলে দিতে দ্বিধা করেননি। পরবর্তী পঞ্চায়েত প্রায় সিংহ ভাগ পেয়ে যায় বিজেপি। আরও একটু এগিয়ে ত্রিপুরার মানুষ তাঁদের দায়িত্ব তুলে দেন বিজেপির হাতে। এই বিধানসভা নির্বাচনে ত্রিপুরায় প্রাথমিক ভাবে সংগঠনের বীজ সামান্যতম ভাবেও বপন করতে ব্যর্থ হন দায়িত্বপ্রাপ্ত মুকুল রায়। তার জন্য মুকুলকে অন্তরালে কথাও শুনতে হয়েছে অনেক। এমনটাই রাজনৈতিক মহলে শোনা যায়। ধীরে ধীরে ক্ষমতাও কমে যায় মুকুলের। তারপরের ঘটনা মুকুলের দলত্যাগ। যদিও মাথা নীচু করে আবার তৃণমূলেই ফিরেছেন মুকুল। তবুও একবারের জন্য ত্রিপুরার জন্য ভাবা হচ্ছে না মুকুলকে। এটাই জানা যাচ্ছে সূত্র মারফত। মুকুলের জায়গায় দলের ছোটো মাঝারি মাপের নেতারা ছুটেছেন ত্রিপুরা। সেই দলের নেতৃত্বে আবার যুবরাজ। হয়তো জিতলে তিনিই হবেন ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী? এক রাজ্যে পিসি, অন্য রাজ্যে পরমাত্মীয়? সে যাক, সেটা নিজেদের ব্যাপার। কীভাবে কী করবেন সেটা তারাই ঠিক করবেন।

ত্রিপুরায় প্রাথমিক ভাবে সংগঠন বাড়াবার লক্ষ্যে দু'বছর আগে থেকেই ঝাঁপিয়ে পড়েছে তৃণমূল। অস্ত্র সেই এক, নাটক। নাটকের কলাকুশলীদের তালিকায় রয়েছেন দেবাংশু, জয়া, সুদীপরা। এখানে যেমন সুপ্রিমো ভাঙা পায়ের নাটক করেছিলেন। ওখানের গেম প্ল্যানের প্রাথমিক ভাবে এই আক্রান্ত হবার নাটক তৈরি করার লক্ষ্যে পাঠানো হয়েছিল যুব ও ছাত্র নেতাদের। তাঁদের কে আক্রমণ করল, আর কেনই বা করল, কারা ঝাঁপাল— সেটা সামান্য ভাবেও প্রমাণিত করতে পারেনি ওই সব নেতারা। উলটে অন্য রাজ্যে গিয়ে শালীনতার মাত্রা ছাড়িয়েছে, ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকে গালিগালাজ করেছেন তাঁরা প্রকাশ্যে, মিডিয়ার সামনে। দেবাংশুদের এই পরিকল্পনাকে বাস্তব রূপ দিতেই ত্রিপুরায় হাজির হয়ে গেলেন তৃণমূল নেতৃত্ব। খোয়াই থানায় বসে হুঙ্কার ছাড়তে লাগলেন।

থানায় ঢুকে তৃণমূল নেতাদের নাটক

কলকাতায় আক্রান্ত ছাত্র নেতাদের এনে চিকিৎসার জন্য হাসপাতালে ভর্তি করে, অন্য এক নাটক শুরু করে দিলেন সুপ্রিমো। ক্যামেরার সামনে পোজ দিয়ে হাসপাতালে আক্রান্তের মাথায় হাত বুলিয়ে দিয়ে ছবি তুললেন। যেমনটি তিনি করে থাকেন। মেদিনীপুরে রাজ্যের নির্বাচনের সময় যেমন পায়ে চোট লাগার নাটক করেছিলেন। তারপর পায়ে ব্যান্ডেজ লাগিয়ে সহানুভূতির একটা হাওয়া তুলেছিলেন। এবার আসি ত্রিপুরায় আক্রান্ত হবার বিষয়ে। এই রাজ্যে দক্ষিণ ২৪ পরগনা সমেত বিভিন্ন জায়গায় যখন পুলিশের সামনেই আক্রান্ত হয়েছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্ব, সে সময় সুপ্রিমো কী করছিলেন? একটিও কথা বলেননি। সেই সময়ে আবার শোনা গিয়েছিল যে বহিরাগতরা এসে রাজ্যে দাঙ্গা বাধাবার চেষ্টা করছে। অন্যদিকে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী কিন্তু এই রাজ্যের শাসক দলের সমস্ত প্রতিনিধি, যারা বারে বারে ছুটে যাচ্ছেন তার রাজ্যে, তাঁদের তিনি অতিথি হিসেবে গণ্য করে স্বাগত জানিয়েছেন। এই হচ্ছে শিষ্টাচার।

পশ্চিমবঙ্গের সাফল্যের পর ত্রিপুরার নির্বাচনী কৌশল ঠিক করার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আইপ্যাককে। তাঁদের জনা ২৩ জন কর্মী প্রশাসনকে না জানিয়ে নানা বিষয়ে গোয়েন্দাগিরি করার চেষ্টা করছিল। সেই সময়ে ত্রিপুরা প্রশাসনের নজরে আসে বিষয়টি। সঙ্গে সঙ্গে তারা তথ্য-তালাশ করার জন্য যে হোটেলে পিকের কর্মীরা ছিলেন, সেখানেই তাঁদের থাকতে বলে, আর প্রশাসনিক স্তরে তাঁদের অনুমতি নেওয়া আছে কিনা, সেই বিষয়েও জানাতে বলা হয়। তারা কিন্তু কাউকে আটক করেননি বা বাধা দেননি। নিয়মের মধ্যে থেকেই শুধু কাজটি করতে বলেছেন। মাননীয়াকে একটাই প্রশ্ন, আপনার রাজ্যে এসে কেউ যদি এভাবে তথ্য-তালাশ করত, সেটা কি আপনি মেনে নিতেন? এমনিতেই আপনার সন্দেহ বাতিক মন, প্রায়ই শোনা যায় যে আপনার দলের থেকেও অতি প্রিয় ভাইপোকে নাকি কিছু করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তার বিমানের আশপাশের আসন গুলিতে নাকি গুন্ডা বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। সত্যি আপনি ভাবতে পারেন অনেক কিছুই। কোনোদিন আপনি হয়তো আপনার হেলিকপ্টারের চালককেও ওই দলে ফেলে দেবেন। তৃণমূলের সাংসদ ডেরেক, আবার নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন তুলতেও দ্বিধা করেননি। তিনি বলেন, 'আমি কি জঙ্গী। আমার জন্য এত পুলিশ।' আচ্ছা সাংসদ মশাই আপনি ভুলে যাচ্ছেন কেন, কলকাতায় সামান্যতম বিজেপির মিছিল বা তেমন কিছু হলে, কত পুলিশ থাকে। ওখানে কি খালি হাতে ঝাণ্ডা ধরে সাধারণ মানুষেরা জঙ্গী আন্দোলন করতে যায়? শুধু বিজেপি কেন, আপনার সরকার তো আন্দোলনরত শিক্ষকদেরও ছাড়েন না। পুলিশের লাঠির আঘাতে ক্ষত-বিক্ষত হয় আন্দোলনকারীদের শরীর। বিরোধীদের যে কোনো আন্দোলনকে ঘিরে পুলিশের তাণ্ডবের কথা না বলাই ভালো। ডেরেকবাবু মনে হয় এসবের খোঁজখবর রাখেন না, বা রাখার চেষ্টা করেন না।

এবার আসা যাক প্রশাসনের কথায়। ত্রিপুরা হচ্ছে সীমান্তবর্তী একটি রাজ্য। সামনে ছিল ১৫ আগস্ট। কোনও গ্রামে যদি দু'জন নতুন অপরিচিত মানুষ আসেন, তাহলে গ্রামের মানুষও খোঁজখবর নিয়ে দেখার চেষ্টা করেন যে, এরা কারা, কোথায় বা এসেছেন, আর কেনই বা এসেছেন। সেই কারণেই হোটেলের ওই ঘটনা ঘটেছে।

এবার আসা যাক ত্রিপুরায় গিয়ে যুবরাজ ও তার সাঙ্গোপাঙ্গরা যে সব কথা বলছেন তার কথায়। তারা বলছেন, উন্নয়নের জোয়ারে ভাসাবেন, কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করবেন, সরকারি কর্মীদের জন্য ভাববেন। তার সঙ্গে জুড়েছেন বিরোধীদের ওপর আক্রমণ ও হত্যালীলা প্রসঙ্গ।

শাসক দলের ওইসব নেতার একবারের জন্যেও কি জিভে কামড় খান না? রাজ্যে গত দশ বছরে একটিও শিল্প হয়নি। বারে বারে কর্মসংস্থানের ভাঁওতা দেওয়া কথায় বেকারেরা হতাশার অন্ধকারে। একটি হাসপাতালে ডোমের চাকরির জন্য আবেদন করছেন ইঞ্জিনিয়ার থেকে উচ্চশিক্ষিত বেকাররা। লজ্জা করে না রাজ্যের শাসক দলের সর্বোচ্চ পদাধিকারীর। ত্রিপুরার বিজেপি সরকার গত কয়েক বছরে ২৫ বছর ধরে থমকে থাকা উন্নয়নকে আবার গতি সঞ্চার করেছে, নতুন কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে নানা পরিকল্পনা গ্রহণ করে, তার বাস্তবায়ন করছে। সামান্য কয়েকটা বছরে। অথচ মাননীয়া দশ বছর পেরিয়ে গেলেও অনুন্নয়নের দায় এড়াতে কখনও কেন্দ্রের ঘাড়ে, নয়তো আগের বাম সরকারের ঘাড়ে দোষ চাপিয়েই চলেছেন।

নিজের রাজ্যে নদীর ড্রেসিং হয় না, বাঁধ মেরামতি হয় না, ঘাটালের মাস্টার প্ল্যান হয় না। বন্যায় ভাসছে একের পর এক জেলা। উনি বা ওনার দল খালি এই বন্যাকে ম্যান মেড বলে চালিয়ে পালাতে চাইছেন। তৃণমূল নেতাদের মুখে সাধারণের দুঃখ দূর করার কথা আসে কোত্থেকে? এক নেত্রী একেবারে দুঃখের সুরে বলছেন, সরকারি কর্মীদের পেনশন কেড়ে নিয়েছে ত্রিপুরা সরকার, দশ হাজার শিক্ষকদের চাকরি গেছে। উনি কই বলছেন না তো, তার রাজ্যের টেট কেলেংকরির কথা। বলছেন না তো সরকারি কর্মীদের বেতন কমিশনের বকেয়া না দেবার কথা। মহার্ঘ্য ভাতা না দেবার কথা একবারের জন্যেও কি আনছেন মুখে? প্রাথমিক শিক্ষকরা কেন যোগ্যতা বাড়িয়েও, যোগ্যতা অনুসারে বেতন পাচ্ছেন না। নেতারা বলছেন ত্রিপুরাতে নাকি বিরোধীদের কণ্ঠরোধ হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলা নাকি ভেঙে পড়েছে। বিরোধী দলের ক্ষেত্রে নাকি হত্যা লীলা চলছে। কই সেই সংবাদ তো কোনো সর্ব ভারতীয় সংবাদমাধ্যমের শিরোনামে আসেনি। মনগড়া কথা বলুন। কিন্তু ভেবে বলাটা কি উচিৎ নয়? এই রাজ্যে বিরোধীরা একেবারে জামাই আদরে তাঁদের সব কথা বলতে পারেন। বিরোধী রাজনীতি করলে একঘরে করে দেয় রাজ্যের শাসক দল। আর হত্যার রাজনীতি, সেটা সংবাদমাধ্যমে উঠে আসা খবরই বলে দেয় রাজ্যে বিরোধীদের অবস্থা কেমন।

শেষে আসি আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গে এখন বিভিন্ন জঙ্গী সংগঠনের নিরাপদ আশ্রয়। বারে বারেই সেটা প্রমাণিত। জায়গায় জায়গায় হয় বোমার কারখানা, নয়তো অস্ত্র কারখানার হদিশ পাচ্ছে পুলিশ। মাদক কারবার থেকে নারী পাচার— সবই চলছে। এমন একটি রাজ্যের শাসক দলের নেতারা গলার শিরা ফুলিয়ে কী করে অন্য রাজ্যের আইন শৃঙ্খলার দিকে আঙুল তোলেন, সেটা ভাবতে গেলেও আশ্চর্য হতে হয়।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)

বাঙ্গালি হিন্দুকে ইতিহাস ভুলিয়ে দেবার পথপ্রদর্শক ঋত্বিক ঘটক

রুদ্র প্রসন্ন ব্যানার্জি

২০০২ সালে অপর্ণা সেন পরিচালিত একটি ছবি মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আয়ার। মিসেস আয়ার যখন তার বাচ্চাকে নিয়ে বাসে করে যাচ্ছিল তখন তার বাবা-মা একজন অপরিচিত যুবককে তাদের মেয়ে এবং নাতির খেয়াল রাখতে বলে কারণ বাসে একদল যুবক উপস্থিত ছিল এবং তার সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের আরো কিছু যাত্রী। অপরিচিত ব্যক্তি নিজের ধর্মীয় পরিচয় প্রকাশ করে জানায় যে সে মুসলমান সম্প্রদায়ের এবং মিসেস আয়ার তখন থেকেই তাঁর প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করতে শুরু করে। বাস চলতে থাকে সিনেমাটিও এগোতে থাকে। কিন্তু মিসেস আইয়ার-এর মনে মুসলমান ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার বদলে যেতে থাকে যখন এক মুসলমান বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে মেরে ফেলল হিন্দুরা। এরপরে মিসেস আইয়ার পুলিশের সামনে সেই মুসলমান ব্যক্তিকে তার স্বামী বলে পরিচয় দেয়। এরপর তাঁদের বন্ধুত্ব বাড়ে এবং ওই মুসলমান যুবককে তিনি চুম্বন করতে যান এবং বাসটা থেমে যায়। সিনেমার শেষ দৃশ্য দেখানো হলো মিসেস আইয়ার-এর প্রকৃত স্বামী তাঁর স্ত্রী ও ছেলেকে নিতে এলেন এবং মিসেস আয়ার সেই মুসলমান ব্যক্তির সঙ্গে পরিচয় করালেন ও বিস্তারিতভাবে সমস্ত ঘটনা জানালেন।

গোটা বিশ্ব জুড়ে ছবিটি দেখানো হলো ও বেশ কিছু আন্তর্জাতিক পুরস্কার পেল। মূল উদ্দেশ্য কী ছিল? গোটা বিশ্বের সামনে দেখানো হলো হিন্দু ধর্মের উন্মত্ত গুন্ডারা কোনো প্ররোচনা ছাড়াই মুসলমান বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে মেরে ফেললেন। গোটা পৃথিবীর ইতিহাস খুঁজে এমন একটা ঘটনা পাওয়া যাবে না যেখানে হিন্দুরা অন্য ধর্মের কোনো মানুষকে আক্রমণ করেছে। স্বামী বিবেকানন্দ নিজে লিখেছেন, মুসলমান আক্রমণ তরঙ্গ ভারতবর্ষে আসবার আগে ধর্ম স্থাপনের জন্য রক্ত সংগ্রাম ভারতবর্ষের মানুষ কখনো চোখে দেখেনি। আরেকটি বিষয় ভীষণ ভাবে লক্ষণীয় যে সিনেমাটির নাম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস আইয়ার। প্রশ্ন হলো কেন মুখার্জী বা সেনগুপ্ত বা গুহ নয়? কারণ বর্তমানে তামিল ব্রাহ্মণরা হিন্দুদের মধ্যে সর্ববিষয়ে সবার চেয়ে এগিয়ে। তাই হিন্দুদের নীচু করে দেখানোর জন্য

এক্ষেত্রে বেছে নেওয়া হলো অসম্ভব মেধাবী আইয়ার পদবিকে।

এবার আসা যাক, কৌশিক গাঙ্গুলির ২০১৭ সালের ছবি বিসর্জন। বাংলাদেশের হিন্দু বিধবা পদ্মা দুর্গা পূজার বিজয়া দশমীর দিন নদীতে এক মুসলমান যুবককে উদ্ধার করল। যদিও মুসলমান যুবককে প্রথমে জানায় দশমীর রাত্রিতে সে ভুল করে এদিকে চলে এসেছিল কিন্তু পরে জানা যায় যে সে আসলে চোরাকারবারি। সেখানকার হিন্দু জমিদার গণেশ বহুদিন ধরেই পদ্মাকে ভালোবাসতো কিন্তু পদ্মা কিছুতেই রাজি হচ্ছে না। পদ্মা অচেনা মুসলমান নাসিরের প্রেমে পড়ে যাওয়ার পরে জানতে পারে যে দেশে তার বান্ধবী আছে। পদ্মা তাকে দেশে ফিরিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করে এবং শেষ রাতে নাসিরের সঙ্গে সঙ্গমে লিপ্ত হয়। সব জেনেও গণেশ পদ্মাকে বিয়ে করে নেয়। সিনেমার শেষে গিয়ে দেখা যায় পদ্মার যে সন্তান সে আসলে নাসিরের সন্তান ছিল। গণেশের চরিত্রে নিজেকে বসিয়ে ভাবুন তো আপনার সঙ্গে এরকম হলে আপনি কী করতেন? আর কৌশিক গাঙ্গুলী কী দেখালেন? উপরি পাওনা, যে বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত হিন্দুরা নির্যাতিত হয়ে চলেছে সেখানে নাকি প্রভাবশালী হিন্দু জমিদার আছে!

এরপরে আসি চিত্রপরিচালক শিবপ্রসাদ মুখার্জির সিনেমা গোত্র প্রসঙ্গে। ছেলে বিদেশে থাকার কারণে বৃদ্ধা মায়ের দেখাশোনা করার জন্য একজন জেলখাটা আসামি মুসলমান যুবককে নিযুক্ত করলেন। নবনিযুক্ত ব্যাক্তির ধর্মীয় পরিচয় বৃদ্ধা মা জানতেন না কিন্তু তার ব্যবহার এবং ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়ে সেই মা তাকে নিজের ছেলের মতো ভালোবেসে ফেললেন এবং এক হিন্দু মেয়ের সঙ্গে তার বিয়েও দিলেন। অর্থাৎ, একজন প্রাক্তন আসামি মুসলমান হলেও সে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে হিন্দু মেয়েকে বিয়ে করতে পারে। কিছুদিন আগেই নিকিতা তোমার বলে একটি মেয়েকে প্রকাশ্য রাস্তায় গুলি করে মারে এক মুসলমান যুবক। কারণ মেয়েটি তাকে বিয়ে করতে রাজি হয়নি— গোত্র সিনেমার সঙ্গে এই ঘটনার কোনো মিল খুঁজে পেলেন নাকি? কণ্ঠ ছবিতে আবার শিবুবাবুর চিকিৎসক আসে ঢাকা থেকে।

শুধুমাত্র তিনটি উদাহরণ দিলাম এরকম আরো কয়েকটি উদাহরণ দিতে পারি সেখানে ক্রমাগতভাবে টলিউডের চিত্রপরিচালকেরা লাভ জিহাদের সমর্থনে ও হিন্দুদের নীচু করে দেখিয়ে সিনেমা বানিয়ে চলেছে। অনুরাগ বসু তার কাবুলিওয়ালা সিরিজে মিনিকে দিয়ে নামাজ পড়িয়ে নিলেন। আপনাদের মনে হতেই পারে ট্র্যাডিশনটা নতুন, বাস্তবে তা একেবারেই নয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের গুপ্তচর সংস্থা কেজিবি গোটা বিশ্ব জুড়ে কমিউনিস্ট মতাদর্শকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করেছিল। Critical theory, Blank state ও Theory driven Cons.— কালচারাল মার্কসিজম-এর এই তিন স্তম্ভকে হাতিয়ার করে। মূল উদ্দেশ্য ছিল যে কোনো দেশের প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থাকে ভুল হিসেবে প্রতিপন্ন করা এবং সমাজের সমস্ত শ্রেণীর মধ্যে বিভাজন তৈরি করে মানুষকে বিপ্লবের আদর্শে বলীয়ান করে তোলা। সামাজিক সংস্কারের মধ্যে দিয়েও যে সমাজের বিভিন্ন বৈষম্য দূর করা যায় তা কমিউনিস্ট আদর্শের বিরুদ্ধে— কমিউনিস্ট আদর্শের মূল উদ্দেশ্যই হলো সমাজের বিভাজনকে আরও প্রকট করে বঞ্চিত শ্রেণীকে দিয়ে বিপ্লব ঘোষণা করা।

কালচারাল মার্কসিজম-এর একটি উদাহরণ দিই তাহলে বুঝতে পারবেন। হীরেন নাগ পরিচালিত, উত্তম কুমার ও সুপ্রিয়া দেবী অভিনীত সবরমতী সিনেমায় উত্তম কুমার ছিলেন অত্যন্ত গরিব ঘরের ছেলে এবং সুপ্রিয়া দেবী ছিলেন বড়োলোকের মেয়ে। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সুপ্রিয়া দেবীর পরিবার কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়ে উত্তম কুমার নিজেকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করে সুপ্রিয়া দেবীকে বিয়ে করলেন। দ্বিতীয় সিনেমাটি মৃণাল সেন পরিচালিত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অপর্ণা সেন অভিনীত আকাশকুসুম। সিনেমার প্রেক্ষাপটটা অনেকটা একই ছিল, গরিব ঘরের ছেলে এবং বড়োলোকের মেয়ে। সিনেমাটি শেষ হলো বড়োলোকের মেয়ের গরিবের ছেলের প্রেম প্রত্যাখ্যানের মধ্যে দিয়ে। টেক হোম ম্যাসেজ : প্রথম ক্ষেত্রে সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে থেকে নিজের ভালোবাসায় অধিকার সম্মানের সঙ্গে গ্রহণ করা ও দ্বিতীয় ক্ষেত্রে প্রচলিত সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে দিয়ে জীবনের আশা পূর্ণ করা সম্ভব নয়— অর্থাৎ বিপ্লবের পথে এসো বন্ধু।

১৯৯১ সালে সোভিয়েতের পতনের সঙ্গে সঙ্গে কমিউনিজমের নগ্নরস গোটা পৃথিবীর সামনে বেরিয়ে আসে। ইতিহাস সাক্ষী, যারা জান্তে বা অজান্তে চাণক্য পণ্ডিতকে অনুসরণ করেছেন, তারা মোটামুটি সবাই সফল আর যারা কার্লমার্কসের অর্থনীতি অনুসরণ করেছেন, তারা সবাই ব্যর্থ। এমনকী কমিউনিস্ট চীনও সাফল্য পেয়েছে বেসরকারি পুঁজির অবাধ অনুপ্রবেশের পর। সোভিয়েতের পতনের পর লেনিন, স্ট্যালিন, মাও, পলপট প্রমুখ কমিউনিস্ট শাসকদের সাড়ে ১২ কোটি মানুষের গণহত্যা করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব আনার গল্প যে মানুষ আর মেনে নেবে না সেটা কমিউনিস্টরা ভালোভাবেই বুঝতে পেরেছিলেন। গোটা বিশ্ব জুড়ে উৎখাত হতে থাকে কমিউনিস্ট মতাদর্শ। সংগঠনকে হাতিয়ার করে মরিচঝাঁপি, বিজন সেতু বা সাঁইবাড়ি গণহত্যা ধামাচাপা দিয়ে বঙ্গেশ্বর জ্যোতিবাবু পার পেয়ে গেছিলেন।

মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, উৎপল দত্তের মতো একনিষ্ঠ কমিউনিস্ট চিত্র ও নাট্য পরিচালকেরা একসময় সিনেমা নাটক তৈরি করে জ্যোতিবাবুর জয়ের রাস্তা প্রশস্ত করে দিয়েছিলেন। তাদেরই পরবর্তী বংশধর বর্তমান চিত্র পরিচালকেরা বুঝতে পেরেছেন সরাসরি কমিউনিস্ট মতাদর্শ বর্তমানে প্রচার করতে গেলে মানুষ জুতোর মালা পরিয়ে ঘোরাবে। কিন্তু তা বলে কি সমাজের বিভাজন বন্ধ থাকবে? তাই সময়মতো 'পরিবর্তন চাই'য়ের হোর্ডিং ফেলে রাজনৈতিক শিবির পরিবর্তন করতে দ্বিধাবোধ করেননি এইসব চিত্র পরিচালকেরা। আর বাকিরা অরাজনৈতিক মোড়কে শুধুমাত্র বিজেপির বিরোধিতা করে ভোটের আগে এই দেশেতেই থাকবো গান গাইছেন। উদ্দেশ্য একটাই, বিভাজন বিভাজন আর বিভাজন। বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের বিভাজন শুধুমাত্র হিন্দুদের দুর্বল করে দিয়ে সম্ভব। তাই যেনতেন প্রকারে হিন্দুদের ছোটো করে দেখানোর নীতি প্রদর্শন করা হচ্ছে সিনেমার মধ্যে দিয়ে। আর বাঙ্গালি হিন্দুকে নিজেদের ইতিহাস ভুলিয়ে দেওয়ার পথপ্রদর্শক ছিলেন ঋত্বিক ঘটক। তিনি জীবনে প্রায় সবকটি ছবি বানিয়েছেন উদ্বাস্তু সমস্যার উপর কিন্তু একটি সিনেমাতে তিনি বলেননি বাংলাদেশ থেকে হিন্দুদের পালিয়ে কেন পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু হতে হয়েছিল। সত্যজিৎ রায় ৪৩-এর দুর্ভিক্ষের উপর ছবি বানালেন, কিন্তু তৎকালীন বাঙ্গলার প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ভূমিকার ব্যাপারে নীরব, যেমনটি অমর্ত্য সেন তার গবেষণায় খাজার ব্যাপারে নির্বাক।

যাদের সিনেমার মাধ্যমে এই বিভাজনের গল্প ফুটিয়ে তোলার যোগ্যতা নেই, তারা বর্তমানে হাফ পর্ন ওয়েব সিরিজ বানাতে ব্যস্ত। আর যাদের সেই যোগ্যতাও নেই তারা ঘণ্টাখানেক টিভির পর্দায় গিয়ে বক্তৃতা দিয়ে নিজেদের ডিএনএ-এর প্রতি সুবিচার করছেন।

(লেখক গবেষক অ্যালবার্ট বিশ্ববিদ্যালয়, কানাডা)

পেগাসাস নিয়ে বালখিল্য আচরণ বিরোধীদের

সুদীপ নারায়ণ ঘোষ

শিশুদের হাতে কোনো জিনিস দিলে তারা সেটার মানে না বুঝে তা মুখে দেয়, কামড়াতে থাকে, আছাড় মারে; আবার কিছু না পেয়ে অন্য কোনো জিনিস খোঁজে; বর্তমান ভারতে বিজেপি তথা ভারত- বিরোধী দলগুলোর অবস্থা তাই।

আমরা এ প্রসঙ্গে সাম্প্রতিকতম 'নন-ইস্যুকে ইস্যু বানানো পেগাসাস' নিয়ে কিছু আলোকপাত করার চেষ্টা করব।

পেগাসাস কী ও কেন?

পেগাসাস মানে পক্ষীরাজ ঘোড়া। কেন এই নাম? কারণ একটা সফট্ওয়্যার আছে পক্ষীরাজ ঘোড়ার মতো তা যে কোনো জায়গায় ঢুকে যেতে পারে। খানিকটা ট্রোজান হর্সের মতো।

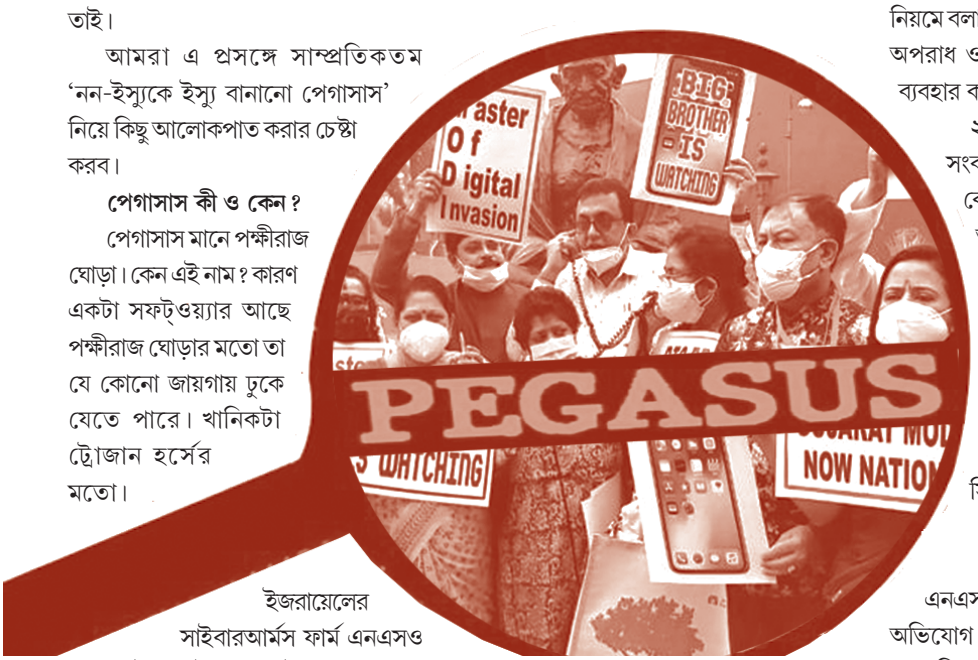

ইজরায়েলের সাইবারআর্মস ফার্ম এনএসও গ্রুপ এই স্পাইওয়্যার উদ্ভাবন করেছে। স্পাইওয়্যার একটা সফট্ওয়্যার তার একটা দুষ্ট অভিসন্ধি থাকে, অন্য ব্যক্তি বা সংগঠন সম্পর্কে তথ্য জোগাড় করে তা অন্য কাউকে দিয়ে ওই ব্যক্তি বা সংগঠনের ক্ষতিসাধন করে, তাদের গোপনীয়তা লঙ্ঘন করে বা তাদের যন্ত্রের নিরাপত্তা বিপন্ন করে। এইরকম আচরণ বৈধ বা অবৈধ যে কোনো সফটওয়্যারের থাকতে পারে। এর নির্দোষ ব্যবহারও আছে। তবে খুব সঠিক সংজ্ঞা দেওয়া সম্ভব নয়।

সাইবারআর্মস হচ্ছে এমন একটা বাজার ও তার সঙ্গী অনুষ্ঠানসমূহ, এরা জিরো ডেজ, সাইবার ওয়েপনারিজ, সার্ভেল্যান্স প্রযুক্তির মতো সফটওয়্যার অস্ত্রকে সাইবার আক্রমণ চালানোর কাজে ব্যবহার করে। দূর থেকে স্মার্টফোনে সর্বক্ষণ নজরদারি চালানোর কাজে এই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছিল নিভ কার্মি, সালেভ হুলিও ও ওমরি লেভির প্রতিষ্ঠিত এই ফার্ম। তাদের নামের আদ্যাক্ষর দিয়ে এই ফার্মের নাম এনএসও।

এখন থেকে এই সফটওয়্যারকে শুধু স্পাইওয়্যার বলব। এই স্পাইওয়্যার মোবাইল ফোন ও অন্যান্য যন্ত্রে আইওএস ও অ্যান্ড্রয়েডের সমস্ত রকম ভাষ্যে গোপনে ঢোকানো হয়। পেগাসাস প্রকল্প হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাংবাদিকতার একটা উদ্যোগ যা দেশে দেশে সরকারগুলো সাংবাদিক, বিরোধী রাজনীতিবিদ, কর্মীগোষ্ঠী, ব্যবসায়ী ও অন্যান্যদের উপর যে গোয়েন্দাগিরি চালায় তা উন্মোচন করে। ২০১৬ সালে টেকস্ট মেসেজ পড়া, কলে আড়িপাতা, পাসওয়ার্ড বের করে ফেলা, ব্যবহারকারীর অবস্থান ঢুঁড়ে ফেলা, লক্ষিত যন্ত্রের মাইক্রোফোন ও ক্যামেরায় পৌঁছে যাওয়া ও ওই অ্যাপ থেকে তথ্য খুঁজে বের করা সব করতে শুরু করে। ওই বছর এর কথা জানাজানি হয় তখন যখন এই সফটওয়্যার একজন মানবাধিকার কর্মীর আইফোনে আক্রমণের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। জেলব্রেক নামে এক পদ্ধতি ব্যবহার করে তা আইফোনের মধ্যে অবাধ প্রবেশক্ষমতা পায়। এটা নীতিবিরোধী বলে মন্তব্য করে অ্যাপল সংস্থা। প্রথমে এর মালিকানা ছিল আমেরিকার বেসরকারি ইক্যুইটি ফার্ম ফ্র্যানসিস্কো পার্টনার্সের হাতে কিন্তু এর প্রতিষ্ঠাতারা সেটা ২০১৯ সালে বাইব্যাক করে। কোম্পানির নিয়মে বলা আছে যে কর্তৃত্বধারক সরকারগুলো অপরাধ ও সন্ত্রাস রুখতে এই স্পাইওয়্যার ব্যবহার করতে পারবে।

২০২০-র ২৩ আগস্ট ইজরায়েলি সংবাদপত্র হারেতস জানায় এনএসও কোটি কোটি টাকা মূল্যে ইউএই ও অন্যান্য উপসাগরীয় দেশগুলিকে এই স্পাইওয়্যার বিক্রি করেছিল সরকারবিরোধী কর্মী, সাংবাদিক ও শত্রু দেশের রাজনৈতিক নেতাদের উপর পর্যবেক্ষণ চালানোর জন্য। ২০২১-এর এই প্রকল্পে বেরিয়েছে যে আইএসওর ১৪.৬ ভার্সন পর্যন্ত সিঁধিয়ে যেতে পারে এই পেগেসাস।

ভারতে পেগাসাস :

২০১৯ সালে ফেসবুক কর্তৃপক্ষ এনএসওর বিরুদ্ধে মামলা করে। তাদের অভিযোগ ছিল এরা ভারতের অনেক কর্মী, সাংবাদিক ও আমলাদের হোয়াটস অ্যাপে ঢুকে পড়ছে। এদের মধ্যে আছে ভারতীয় মন্ত্রী, বিরোধী নেতা, প্রাক্তন নির্বাচন কমিশনার ও সাংবাদিকরা। দশটা ভারতীয় ফোন নম্বরের ডিজিটাল ফরেন্সিক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে তাদের উপর আড়িপাতার ব্যর্থ বা সফল প্রচেষ্টা হয়েছিল। এদের মধ্যে ছিলেন সুপ্রিম কোর্টের এক মহিলা কর্মী যিনি প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গগোইয়ের বিরুদ্ধে যৌন হেনস্থার অভিযোগ এনেছিলেন। 'দ্য ওয়্যার' নামক একটি বামপন্থী নিউজ পোর্টাল ভারতের প্রায় ৩০০ ফোনে ভারত সরকার গোপনে আড়ি পেতে আছে এই তথ্য প্রকাশ করে। ওরা এই খবর 'অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল' আর 'ফরবিডেন স্টোরিজ'-এর থেকে পেয়েছে বলে দাবি করে। অ্যামনেস্টির নিজস্ব ফরেন্সিক ল্যাবরেটরি সিটিজেন ল্যাবে কিছু ফোন নম্বরের

ফঃ ৩

ফরেন্সিক পরীক্ষা হয়, সেইসব পরীক্ষায় এই তথ্য আসে। ফোন নম্বরের মধ্যে রাহুল গান্ধী, স্মৃতি ইরানি, অশ্বিনী বৈষ্ণব, অভিষেক ব্যানার্জি, প্রশান্ত কিশোর আরও অনেকের নম্বরই রয়েছে।

২০২১-এর জুলাই মাসে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল জানায় এখনো এটা বহুল ভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারত সরকার এতে জড়িত। কর্ণাটকে যখন ক্ষমতাদখলের তীব্র প্রতিযোগিতা চলছিল কংগ্রেস ও বিজেপির মধ্যে তখন কয়েকজন মুখ্য রাজনৈতিক নেতার ফোনে এই স্পাইওয়্যার ব্যবহৃত হয়েছিল। কিন্তু এনএসওর সিইও সুনির্দিষ্টভাবে বলেছেন যে এই সংশ্লিষ্ট তালিকার সঙ্গে তাদের কোনো সম্পর্ক নেই। এই অভিযোগের উৎস নির্ভরযোগ্য কিনা যাচাই করা যায় না। ভয়ংকরভাবে তথ্যের অভাব রয়েছে ও তাই নিয়ে কিছু একটা বানানোর এটা এক ব্যর্থ প্রচেষ্টা। এই তদন্তের গোড়ায় গলদ আছে।

শীর্ষ আদালতে নালিশ :

কেন্দ্রের জবাব দাবি করে শীর্ষ আদালতে নথি পিটিশন দাখিল করা হয়েছে, শুনানি চলছে। প্রধান বিচারপতি এনভি রামান্না ও বিচারপতি সূর্যকান্তের বেঞ্চ বলেছে পেগাসাস ফোনের তথ্য চুরি করেছে এমন নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া যায়নি। আবেদনকারীরা খবরের কাগজের প্রতিবেদনকে প্রমাণ হিসেবে দাখিল করলে শীর্ষ আদালত তা অগ্রাহ্য করে আর সেই কারণেই এই বিষয়ে যা বলার তা আদালতে বলাই ভালো বলে মন্তব্য করে। সোশ্যাল মিডিয়াতে এই নিয়ে আলোচনা করার কোনো মানে হয় না বলে তাঁরা মন্তব্য করেন।

প্রধান বিচারপতি আরও বলেন ২০১৯ সালেও ফোনে আড়িপাতার অভিযোগ উঠেছিল তারও কোনো তথ্য জোগাড় হয়েছে কিনা তা জানা যায়নি। যতদিন না এই বিষয়ে পোক্ত প্রমাণ জোগাড় হচ্ছে ততদিন এর রায় দেওয়া যাবে না। এডিটরস গিল্ড একাধিক মামলা দায়ের করে জানিয়েছে এই বিষয়ে কেন্দ্রের কাছে জবাবদিহি তলব করুক শীর্ষ আদালত। এই আবেদনের উত্তরে শীর্ষ আদালতের বিচারপতিরা বলেছেন মামলাকারীরা সত্যিই যদি মনে করেন পেগাসাসের মতো কোনো স্পাইওয়্যার ফোনে আড়ি পাতছে এবং তার পিছনে কোনও সরকারি ইন্ধন আছে তাহলে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা দায়ের করা উচিত ছিল কিন্তু এখনও পর্যন্ত তেমন কোনও মামলা দায়ের করা হয়নি।

এই ইস্যুতে বর্তমানে সংসদের উভয় কক্ষে বিরোধী সাংসদরা সভার অধিবেশন অচল করে রেখেছেন। এক্ষেত্রে সবচেয়ে ন্যক্কারজনক ভূমিকা তৃণমূলের। এমনকী রাজ্যসভার চেয়ারম্যান ও উপরাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নাইডু তাঁদের চেয়ারে বসে বক্তব্য রাখতে গিয়ে কেঁদে ফেলেছেন ১১ আগস্ট। কৃষিবিল নিয়ে আলোচনার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর বক্তব্য পেশ করতে ওঠেন। এক তৃণমূল সাংসদ তা ছিঁড়ে ফেলেন ও এক কংগ্রেস সাংসদ সেই বেঞ্চের উপর উঠে দাঁড়িয়ে অশ্লীল অঙ্গভঙ্গী করছিলেন।

কারা আছে এই গুজবের পিছনে?

রাহুল গান্ধী নিজের ফোন ফরেন্সিক পরীক্ষা দিতে রাজি হচ্ছেন না, নানারকম টালবাহানা করে চলেছেন। এক বিখ্যাত দ্বিপাক্ষিক দেশি পত্রিকার মতে রাহুল নাকি সেই ফোন আর ব্যবহার করছেন না। অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল মুশকিলে পড়েছে, মিথ্যার বেলুন ফেটে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে ওরা নিজেদের বয়ান বদলে ফেলে। বলে ওই নম্বরগুলোতে আসলে আড়ি পাতা হয়নি, যদি সরকার মনে করে যে আড়ি পাতবে তাহলে ওইগুলোই আড়ি পাতার সম্ভাব্য নম্বর।

এতসব কিছু করার টাকাটা কে জোগাচ্ছে? অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, সিটিজেন ল্যাব এবং ফরবিডেন স্টোরিজকে অর্থ জোগায় বা জুগিয়ে চলেছে কোটিপতি ব্যবসায়ী এবং ইহুদি গণহত্যার সময়ে তাদের সঙ্গে বেইমানি করা হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি জর্জ সোরোস (এর সংস্থাকে হাঙ্গেরি সরকার তাড়িয়ে দিয়েছে)

এই জর্জ সোরোস হিন্দু ও ভারত সরকারের বিরোধী। নরেন্দ্র মোদী সম্পর্কে সোরোসের মনোভাব সবাই জনে।

ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারানোর জন্য ডেমোক্র্যাটদের হয়ে প্রচারে জলের মতো ডলার ব্যয় করেছিল এই সোরোস।

বামপন্থী নিউজ পোর্টাল অনেক আছে; এই খবরটা দ্য ওয়্যারে বেরোলো কেন?

সোরোসের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বান্ধবী ছিলেন এক হাঙ্গেরিয়ান ইহুদি ম্যাগডোলান ফ্রিডম্যান যিনি ভারতবাসীর কাছে শোভা নেহরু বা ফোরি আন্টি নামে পরিচিত।

ম্যাগডোলান ফ্রিডম্যান বিয়ে করেছিলেন ইন্দিরা গান্ধীর কাজিন ব্রজ কুমার নেহরুকে (ইনি আমেরিকায় ভারতের রাষ্ট্রদূত এবং অসমের রাজ্যপাল ছিলেন)। শোভা নেহরুর একশোতম জন্মদিনে জর্জ সোরোস গোপনে ভারতে এসেছিল কিংফিসার কোম্পানির প্রাইভেট বিমানে করে। তাদের ছেলে অনিল নেহরুর বাড়িতে উপস্থিত ছিলেন রাহুল গান্ধী শোভাদেবীকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানাতে। নেহরু-গান্ধী পরিবারের সঙ্গে এই জর্জ সোরোসের সম্পর্কটা বহুদিনের। জওহরলাল নেহেরুর ভাগ্নী নয়নতারা সেহগল (বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিতের মেয়ে)। নয়নতারা সেহগলের ননদ বিমলা সেহগল (বিয়ের পর বিমলা থাপার; জেনারেল প্রাণনাথ থাপারের স্ত্রী)-এর চতুর্থ ও কনিষ্ঠ পুত্র হলো স্বনামধন্য করণ থাপার বর্তমানে দ্য ওয়্যার-এর একজন বিশিষ্ট সাংবাদিক। সংসদের এই বাদল অধিবেশনে সরকার অন্তত ৭টি গুরুত্বপূর্ণ বিল আনতে চলেছে। যাতে সেগুলো না করা যায় তাই পেগাসাস নিয়ে এত হৈচৈ। মূল হোতা, টাকার উৎস, এই সময় কেন বাছা হলো, দ্য ওয়্যারেই কেন খবরটা বেরোলো সবই পরিষ্কার।

এদের উৎস দেওয়ান কুঞ্জবিহারি থাপার, উমর হায়াৎ খান, চৌধুরী গজ্জন সিংহ ও রায় বাহাদুর লাল চাঁদ মিলে নিরীহ ৩৭৯ জনের হত্যাকারী জেনারেল মাইকেল ও ডায়ারকে একটা সোনার কৃপাণ, একটা শিরোপা ও ১ লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকা (সেই সময়ে, ১৯১৯) উপঢৌকন দিয়েছিলেন। তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মিতে তাঁর পদ বহাল রাখতে তাঁর ব্রিটিশ প্রভুদের যতদূর সম্ভব মোসাহেবি করেছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের কালে তিনি ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির কমিশনপ্রাপ্ত দালালি করে পয়সা করেছিলেন এবং তিনিই তাঁর বংশের প্রথম ধনী ব্যক্তি হয়েছিলেন এইভাবে। তাঁর প্রভুভক্তির জেরে ব্রিটিশরা ১৯২০ সালে তাঁকে মোস্ট এক্সসিলেন্ট অর্ডার অব দি ব্রিটিশ এম্পায়ার পুরস্কারে ভূষিত করেন। এহেন পূর্বজের বংশধর এই সব নেহরুবাদী সাচ্চা কমিউনিস্ট রোমিলা থাপার, রমেশ থাপার, করণ থাপার। জিনিয়োলজি বুঝুন।

(লেখক বিশিষ্ট গবেষক এবং প্রাবন্ধিক)

ভগিনী নিবেদিতা ও ভারতের সশস্ত্র বিপ্লব

'তাঁর মুখ থেকে যে কথা শুনেছিলাম তা কখনও ভুলব না। ব্রিটিশ শাসনের সম্বন্ধে তাঁর দারুণ ঘৃণা এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রবল ভালোবাসা। রাজনীতিতে তিনি মাৎসিনী-নীতির অনুসারী ছিলেন।'

সুতপা বসাক ভড়

শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব, শ্রীমা সারদা, স্বামী বিবেকানন্দের নিবেদিতা— এই পরিচয়ে স্বচ্ছন্দ্য বোধ করতেন তিনি। স্বামী বিবেকানন্দের শিষ্যা তিনি। অন্তরের একান্ত ইচ্ছা ছিল সন্ন্যাসিনী হবার, অথচ তাঁর গুরু তাঁকে ব্রহ্মচারিণী রূপে নিবেদন করেছিলেন— দেশমাতৃকার সেবার নিমিত্ত। একটি পত্রে তিনি লেখেন, 'সর্বপ্রকার শক্তি তোমাতে উদ্বুদ্ধ হোক। মহামায়া তোমার বাহুতে ও হৃদয়ে অধিষ্ঠিত হোন। অপ্রতিহত মহাশক্তি তোমাতে জাগ্রত হোক। এবং সম্ভব হলে সঙ্গে সঙ্গে অসীম শান্তিও তুমি লাভ কর— এই আমার প্রার্থনা।...'

সমাজ বিজ্ঞানী অধ্যাপক বিনয় সরকার, যিনি ডন স্যোসাইটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁর উক্তি : 'বিবেকানন্দ আর কিছু না করে যদি কেবল নিবেদিতাকে এনে ভারতীয় কার্যাবলীর সঙ্গে যুক্ত করে দিতেন, তাহলেও তাঁর কর্মজীবন সফল ও যুগসৃষ্টিকারী একথা বলা যেত। নিবেদিতা ভারতের জন্য বিবেকানন্দের অলৌকিক আবিষ্কার। নিবেদিতা ভারতীয় জনগণের জন্য মহাসম্পদ।'—প্রবুদ্ধ ভারত, অক্টোবর, ১৯৪৬।

রমেশচন্দ্র মজুমদার History of Freedom Movement (প্রথম খণ্ডে) জানিয়েছেন, অনুশীলন সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সতীশ বসু নিবেদিতার থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ পেতেন। এছাড়াও তিনি অনুশীলন সমিতির প্রথম বিপ্লবী পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন। ওকাকুরা যে বৈপ্লবিক প্রয়াস করেন, তাতেও তাঁর যোগ ছিল। তিনি বিভিন্ন প্রকার বৈপ্লবিক সাহিত্য বিপ্লবীদের উপহার দিয়েছিলেন। কিন্তু স্বদেশী ডাকাতি তিনি সমর্থন করতেন না। নিবেদিতার রাজনৈতিক জীবনখণ্ডের আলোচনার পর্যাপ্ত সূত্রপাত করেন লিজেল রেঁম। তিনি লিখছেন, 'মিস ম্যাকলাউড নিবেদিতার সম্বন্ধে খুবই উচ্চভাষায় কথা বলতেন। স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর সন্ন্যাস জীবনের জন্য যে কাজ করতে পারেননি, ভারতবর্ষে সেই কাজ সম্পাদনের জন্য নিবেদিতাকে তিনি নির্বাচন করেছিলেন। নিবেদিতা আইরিশ, বৈপ্লবিক ঐতিহ্যে লালিত, বিপ্লবী প্রিন্স ক্রুপট্‌কিনকে তিনি জানতেন।

১৯০৫ সালে চরমপন্থী নেতা লালা লাজপত রায় নিবেদিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে লিখেছেন : 'তাঁর মুখ থেকে যে কথা শুনেছিলাম তা কখনও ভুলব না। ব্রিটিশ শাসনের সম্বন্ধে তাঁর দারুণ ঘৃণা এবং ভারতবাসী সম্বন্ধে তাঁর প্রবল ভালোবাসা। রাজনীতিতে তিনি মাৎসিনী-নীতির অনুসারী ছিলেন।'

নিবেদিতার কিছু বৈপ্লবিক চরিত্র :

(১) ক্ষতিকর ব্যক্তিকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেবার সিদ্ধান্তকে দোষ মনে করতেন না; আবার রাজনীতির নাম করে অবিবেচক হত্যাকাণ্ডও সমর্থন করেননি। (২) দেশের মানুষের সম্পত্তি লুঠ করাকে কাপুরুষতা মনে করতেন। (৩) গ্রেপ্তারি এড়ানোর জন্য ছদ্মবেশ নিয়েছেন। দেশ ছেড়েছেন। (৪) তাঁর নিজস্ব একটি দল ছিল। (৫) বিদেশি অস্ত্র আমদানিতে হয়তো যুক্ত ছিলেন। (৬) রাজনৈতিক প্রয়োজনে শাসনের উপরতলার মানুষদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। অথচ মন্ত্রগুপ্তি বজায় রাখতেন। (৭) রাজনৈতিক খবর বিদেশে পাঠাতেন এবং সেখান থেকে এজেন্ট মারফৎ পুস্তকাবলী ও পত্র-পত্রিকা আনাতেন। (৮) তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমতী, নানান বিদগ্ধ জনের কাছে নানান ভূমিকা পালন করতেন, কিন্তু মূল উদ্দেশ্যে অবিচল ছিলেন।

বারীন্দ্রনাথ ঘোষের স্বহস্তে লেখা নোট থেকে জানতে পারি, '১৯০২ আগস্ট থেকে ১৯০৬ আগস্ট— এই পুরো চার বৎসর ভগিনী নিবেদিতা বাঙ্গলা ও ভারতের কাজ করেছেন— বক্তৃতা, ব্যক্তিগত যোগাযোগ, রচনা ও নানাবিধ কার্যাবলীর দ্বারা তরুণদের মধ্যে বৈপ্লবিক ভাবধারা প্রচার করেছেন। বৈপ্লবিক ভারতের যথার্থ নেতা শ্রীঅরবিন্দ চিত্রে আবির্ভূত হবার পূর্বে এইসকল ঘটেছে।'

যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় স্বামীজী ও নিবেদিতার সংস্পর্শে ছিলেন। 'বালভারত' পত্রিকার সম্পাদক সুব্রহ্মণ্য ভারতী ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতার অনুরাগী। নিবেদিতা চিত্তরঞ্জন দাশকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। ▯

ব্রেস্ট ক্যানসারের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা

ডাঃ প্রকাশ মল্লিক

সন্তানদের জন্য মাতৃস্তন্য পান শরীরের ক্ষেত্রে বিশেষ উপকার দেয়, মাতৃদুগ্ধর থেকে শিশুর পুষ্টি উপাদানের পুরোটাই পূরণ হয়। কিন্তু নতুন মায়েদের ক্ষেত্রে কোনও কোনও সময়ে স্তন্যপান করানো ব্যাপারটা বেশ চ্যালেঞ্জিং হয়ে ওঠে, বেশ কিছু জটিলতার জন্য। এর মধ্যে একটি হলো সোর নিপলস বা স্তনবৃন্তে ব্যথা। স্তন্যদানকারী মায়েদের সচরাচর যেসব সমস্যার মুখে পড়তে হয়, তার মধ্যে অন্যতম হলো সোর নিপলস। যদিও এটা একটা সমস্যা, তবে স্তন্যপান করানোর ক্ষেত্রে এটা সেভাবে কোনও সমস্যা তৈরি করে না।

সন্তানের জন্মদানের কয়েকদিন পরেই যখন সন্তান মাতৃদুগ্ধ খেতে শুরু করেছে তখন স্তনবৃন্তে ব্যথা হওয়া নতুন মায়েদের অনেকের ক্ষেত্রেই ঘটে। এমনকী স্তন্যপান শুরু করানোর পরে কয়েক সপ্তাহে বা দু-একমাসের মধ্যেও এই স্তনবৃন্তে ব্যথা হওয়ার অনুভূতি হতে পারে। যখন বাচ্চা মাতৃদুগ্ধ খেতে শুরু করছে তার কয়েক মিনিট বা কয়েক সেকেন্ড পর পর্যন্ত স্তনবৃন্তে ব্যথা হওয়াটা স্বাভাবিক, কিন্তু এর থেকে বেশি সময় ধরে যদি ব্যথা থাকে, তাহলে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। ব্যথার জায়গাটাতে অস্বস্তি, স্তনবৃন্ত ফুলে যাওয়া ইত্যাদির যদি সমাধান না করা হয়, তাহলে স্তনবৃন্ত থেকে রক্তপাত বা তা ফেটে যাওয়ার (ক্র্যাকড নিপলস) সমস্যা ভোগাতে পারে।

স্তনবৃন্তের চারপাশে অস্বস্তি : কখনও কখনও মায়েদের স্তনবৃন্তের চারপাশে অস্বস্তি অনুভূত হয়। যেসব বাচ্চার দাঁত উঠে গেছে তবুও স্তন্যপান করছে তাদের মায়েদের সোর নিপলসের সমস্যা হয়। স্তন্যপানের সময়ে বাচ্চার মুখ থেকে অতিরিক্ত স্যালাইভা ও অন্যান্য উৎসেচক বের হয়ে মায়ের স্তনবৃন্তের চারপাশে একটি অস্বস্তির অনুভূতি সৃষ্টি করে।

স্তনবৃন্তের নালীতে প্লাক থাকা : প্লাকড মিল্ক ডাক্ট মানে দুগ্ধ সরবরাহকারী নালীতে কোনওরকম ব্লক থাকলে বা স্তনে ম্যাসটাইটিসের মতো কোনও সমস্যা হলে সোর নিপলসের সমস্যা হয়। এটি মূলত একটি স্তনবৃন্তে হয়, কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে রোগটি দুটি স্তনবৃন্তেও হতে পারে।

যে কোনও ধরনের হরমোনগত পরিবর্তন : স্তনবৃন্তে ব্যথার সমস্যাটি অনেকেরই মাসিক পিরিয়ডস শুরু হওয়ার আগে হয় হরমোনের পরিবর্তনজনিত কারণে। কেউ যদি গর্ভবতী হন, তাহলেও তার ক্ষেত্রে স্তনবৃন্তে ব্যথা হয়।

সোর নিপলসের সমাধানে নিম্নলিখিত কয়েকটি পদ্ধতি অবলম্বন করতে বলা হয় : বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর পরে স্তন-সহ স্তনবৃন্ত ভালো করে ধুয়ে শুকিয়ে নিন। স্তন্যর কিছুটা বের করে ব্যথা জায়গাটায় লাগান। সোর নিপলস হলে সেখানে গরম জলে সেকের মাধ্যমে আরাম মিলবে। খুব বেশি ব্যথা হলে হাত দিয়ে চিপে দুধ কিছুটা বের করে দিন নতুবা ব্রেস্ট পাম্পের সাহায্য নিন। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল সাবান দিয়ে স্তন ধুয়ে নিলে সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। তবে ব্যথা বা সংক্রমণ খুব বেড়ে গেলে চিকিৎসকরা কয়েক ধরনের অয়েন্টমেন্ট দিয়ে চিকিৎসা করেন।

সোর নিপলসের সমস্যা সামলানোর কিছু ঘরোয়া সমাধান স্তন্যপানের আগে : বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর সময়ে যথাসম্ভব নিজেকে রিল্যাক্সড রাখুন। স্তনকে আস্তে আস্তে ম্যাসাজ করুন, যাতে স্তন্যের সরবরাহ ঠিক থাকে। শুষ্ক স্তনবৃন্তকে ল্যুব্রিকেট করতে কিছুটা দুধ টিপে বের করে স্তনবৃন্তে লাগিয়ে দিন। একবার বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর পরে দ্বিতীয়বারের স্তন্যপান খুব বেশি দেরিতে করবেন না। এতে বাচ্চার খিদে বেড়ে গিয়ে জোরে জোরে সে স্তনবৃন্তে কামড় বসাবে।

স্তন্যপানের সময় : বাচ্চাকে স্তন্যপান করানোর সময় বিবিধ ফিডিং পজিশন বেছে নিন। বালিশের সাহায্য নিন বাচ্চাকে ঠিকভাবে পজিশন নেওয়ানোর জন্য। স্তন্যপান করানোর পরে— অন্তর্বাস কিছুক্ষণ পর্যন্ত খুলে রাখুন। নিপল প্রোটেক্টার ব্যবহার করতে পারেন, যাতে জামার ঘষায় স্তনবৃন্তের ক্ষতি না হয়। সূতির ব্রেস্ট প্যাড ব্যবহার করুন ও খানিকক্ষণ পর তা বদলান।

হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা : কারণ লক্ষণ ও মায়াজম মিলিয়ে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করলে সুফল পাওয়া যাবে। এক কথায় বলব ম্যামোগ্রাফি করার জন্য অনেক সময় ব্যথা ক্যানসারের কারণ হতে পারে। স্তন ক্যানসারের জন্য হোমিও প্যাথি চিকিৎসা বিশেষ ভাবে ফলপ্রসূ। প্রথমে চিকিৎসা শুরু করলে জীবনহানি হবে না।

(লেখক বিশিষ্ট হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক)

নীরজ চোপড়া

ভারতের সোনালি রুপালি ছেলেমেয়েরা

নিলয় সামন্ত

কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্পের ফল হাতেনাতে পাওয়া গেল। এবারের আঠাশতম অলিম্পিক্সে সাতটি পদক হয়ে গেল ভারতের। এটিই অলিম্পিক্সে ভারতের সর্বকালের সেরা পারফরম্যান্স। এতদিন রেকর্ড ছিল ২০১২ সালে লন্ডন অলিম্পিক্সে ছয়টি পদক। এবার ভারতকে প্রথম পদক এনে দেন মীরাবাই চানু। ২৪ জুলাই কুস্তিতে মহিলাদের ৪৯ কেজি বিভাগে রুপো জেতেন চানু। অথচ পাঁচ বছর আগে রিয়ো অলিম্পিক্সে বৈধ ভাবে ওজন তুলতে না পেরে তিনি বাতিল হয়ে গিয়েছিলেন। ওই দিনই রিয়োর মাটিতে দাঁড়িয়ে শপথ নিয়েছিলেন, টোকিয়ো অলিম্পিক্সে পদক তাঁকে পেতেই হবে। গত পাঁচ বছর ধরে এই দিনটার স্বপ্ন দেখেছিলেন চানু। সেই স্বপ্ন বাস্তব করতে দিনে ৮ ঘণ্টার বেশি অনুশীলন করতে হতো। জেতার দুদিন আগে থেকেও তাঁকে কার্যত উপোশ করে থাকতে হয়েছিল দু' কেজি ওজন কমানোর জন্য। ট্রেনিং পদ্ধতি বদলানোর ফল পান ২০১৭ সালের বিশ্বচ্যাম্পিয়নশিপে। তার পর ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমসে সোনা আসে। মাঝের এই পাঁচটা বছর চানু ভারোত্তোলনের বাইরে কিছু ভাবেননি।

পরের পদকটি জেতার জন্য ভারতকে অপেক্ষা করতে হয় এক সপ্তাহ। ১ আগস্ট ব্যাডমিন্টনে ব্রোঞ্জ জেতেন পিভি সিন্ধু। পর পর দু'বার অলিম্পিক্স পদক জিতে রেকর্ড করে ফেলেছেন পিভি সিন্ধু। টোকিয়ো অলিম্পিক্সে সিন্ধু-ঝড়ের কাছে উড়ে গিয়েছেন চীনের হি বিংজিয়ায়ো। ২১-১৩, ২১-১৫ ব্যবধানে তাঁকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিয়েছেন সিন্ধু।

এরপর পদক আসে বক্সিংয়ে। ৪ আগস্ট মহিলাদের ওয়েল্টারওয়েট বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন লভলিনা বড়োগোঞাই। প্রথমবার অলিম্পিকে কোয়াটার ফাইনালে যে দাপট দেখিয়ে সেমিফাইনালে উঠেছিলেন লাভলিনা বড়োগোঞাই, তাতে তাঁর উপর দেশবাসীর প্রত্যাশা অনেকটাই বেড়ে গিয়েছিল। কিন্তু টোকিয়ো অলিম্পিক্সে মহিলাদের ওয়েল্টার ওয়েট বক্সিংয়ে সেমিফাইনালেই থেমে গেলেন লভলিনা বড়োগোঞাই। তুরস্কের বুসেনাজ সুরমেনেলির বিরুদ্ধে ০-৫ ব্যবধানে হেরে গেলেন লভলিনা। ব্রোঞ্জ পদক পান তিনি। এবারের অলিম্পিক্সে তিন নম্বর পদক ভারতের।

শুরু থেকেই বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন সুরমেনেলির বিরুদ্ধে পিছিয়ে ছিলেন লভলিনা। ২৪ বছরের ভারতীয় বক্সারকে যেন ক্লান্ত দেখাচ্ছিল সেদিন। সেমিফাইনালে হেরে ব্রোঞ্জ নিয়েই খুশি থাকতে হলো তাঁকে।

মীরাবাই চানু

সাঁইখোম মীরাবাই চানু এবার টোকিও অলিম্পিকে ৪৯ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক জিতেছেন। মীরাবাই ১৯৯৪ সালে নংপোক কাকিং, ইম্ফল ইস্ট, মণিপুরে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতীয় ভারত্তোলক মীরাবাই চানু ২০১৪ সাল থেকে আন্তর্জাতিক ইভেন্টে ৪৮ কেজি শ্রেণীতে একজন নিয়মিত খেলোয়াড়। ২০১৪ সালে গ্লাসগো, স্কটল্যান্ডে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ গেমসে চানু ৪৮ কেজি বিভাগে রৌপ্য পদক জিতেছেন। ২০১৭ সালে অনুষ্ঠিত বিশ্ব ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে চানু ১৯৪ (মোট) কেজি (স্ন্যাচে ৮৫ কেজি এবং ক্লিন ও জার্কে ১০৯ কেজি) উত্তোলন করে গেমস রেকর্ড ভেঙে স্বর্ণ পদক লাভ করেন। ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে আয়োজিত এশিয়ান ওয়েট লিফটিং চ্যাম্পিয়নশিপে মীরাবাই স্ন্যাচে ৮৬ কেজি ও ক্লিন জার্কে ১১৯ কেজি অর্থাৎ মোট ২০৫ কেজি উত্তোলন করে ব্রোঞ্জ পদক জয়লাভ করে।

পি.ভি. সিন্ধু

ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় পুসারলা ভেঙ্কট সিন্ধু নামটি এই মুহূর্তে ভারতবর্ষের ক্রীড়াজগতের একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র। ২০২০-তে অলিম্পিকে ব্যাডমিন্টনে ভারতের হয়ে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন তিনি। ডান হাতি পি.ভি. সিন্ধু উচ্চতায় ৫ ফুট ১০ ইঞ্চি। সিন্ধু ২০২০-তে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক গেমসের ৩২তম আসরে ব্যাডমিন্টন মহিলাদের একক ইভেন্টে ব্রোঞ্জ জয়ী হন। পি.ভি. সিন্ধু ২০১৬-তে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিকে মহিলাদের ব্যাডমিন্টন একক ইভেন্টে রৌপ্য পদক জয় করেছেন।

বাবা পি.ভি. রামানা ও মা পি বিজয়া উভয়েই পূর্বের ভলিবল খেলোয়াড়। পি.ভি. সিন্ধু মাত্র আট বছর বয়স থেকে ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেন। সিন্ধু প্রথমে 'ইন্ডিয়ান রেলওয়ে সংকেত প্রকৌশলে ও টেলিযোগাযোগ ইনস্টিটিউট-এর ব্যাডমিন্টন কোর্টে মেহবুব আলির কাছে খেলার প্রারম্ভিক শিক্ষা নেন। পরেই তিনি পুল্লেলা গোপীচাঁদের ব্যাডমিন্টন একাডেমি যোগদান করেন। তিনি ২১ সেপ্টেম্বর ২০২১-এ ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন র‍্যাঙ্কিংয়ে শীর্ষ ২০ ব্যাডমিন্টনে স্থান করে নেন। তিনি ভারতের সব থেকে কম বয়সী মহিলা খেলোয়াড় যিনি অলিম্পিকে রৌপ্য পদক জেতেন।

দেশের তৃতীয় বক্সার হিসেবে অলিম্পিক্সে পদক পান লভলিনা। পরের দিন ৫ আগস্ট ভারত জোড়া পদক জেতে। কুস্তি এবং হকিতে পদক পায় ভারত। কুস্তিতে ভারতকে প্রথম পদক এনে দেন রবি কুমার দাহিয়া। তিনি ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইলে রুপো জেতেন। আশা জাগিয়েও শেষ ধাপে এসে আটকে গেলেন রবি দাহিয়া। পুরুষদের কুস্তিতে রুপোতেই সন্তুষ্ট থাকতে হলো তাঁকে। রাশিয়ার জাভুর উগুয়েভের বিরুদ্ধে নেমেছিলেন রবি। শুরুতে জাভুর এগিয়ে গেলেও পালটা লড়াইয়ে ফিরে এসেছিলেন তিনি। প্রথম রাউণ্ডের শেষে ২-৪ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন জাভুর। দ্বিতীয়ার্ধে কৌশল সামান্য বদলে রবির থেকে ম্যাচ ক্রমশ কেড়ে নিতে থাকেন রাশিয়ার কুস্তিগির। একসময় ২-৭ পিছিয়ে পড়েছিলেন রবি। সেখান থেকে লড়াই করে ৪-৭ করে দেন। তবে আগের ম্যাচের মতো শেষ মুহূর্তে কোনও চমক দিতে পারেননি তিনি। তাই এবারের মতো রুপোতেই থেমে যেতে হলো তাঁকে।

একই দিনে পুরুষদের হকিতে ব্রোঞ্জ পায় ভারত। ৪১ বছর পরে অলিম্পিক্সে হকিতে পদক জেতে ভারত। ফিল্ড হকিতে অলিপিক্সে বিরাট কৃতিত্ব স্থাপন করল ভারত। ৪১ বছর পর হকিতে দেশকে পদক এনে দিলেন তাঁরা। জার্মানিকে ৫-৪ গোলে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জিতে নিল ভারত। ভারত প্রথম কোয়ার্টারে ০-১ গোলে পিছিয়ে ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টার শুরু হতেই গোল করেন সিমরনজিৎ। লড়াইয়ে ফেরে ভারত। জার্মানি ফের লিড নিলেও ভেঙে পড়েনি দল। এক সময় ১-৩ গোলে পিছিয়ে গিয়েছিল ভারত। কিন্তু দ্বিতীয় কোয়ার্টারেই ম্যাচে ফেরেন মনপ্রীতরা। দুই গোল শোধ করে ফিরে আসেন তাঁরা। বুঝিয়ে দেন পদক জেতাই তাঁদের একমাত্র লক্ষ্য। দ্বিতীয় কোয়ার্টার দুই দল মিলিয়ে পাঁচ গোল করে। তৃতীয় কোয়ার্টারের শুরুতেই পেনাল্টি পেয়ে যায় ভারত। গোল করতে ভুল করেননি রুপিন্দর পাল সিংহ।

এই ব্রোঞ্জ পদক জয়ের ফলে ভারত অলিম্পিক গেমস থেকে মোট বারোটি পদক জয় করল। যা যে কোনও দেশের ধরাছোঁয়ার বাইরে। ৭ আগস্ট ফের জোড়া পদক জেতে ভারত। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে। প্রথম কুস্তিতে ৬৫ কেজি বিভাগে ব্রোঞ্জ জেতেন বজরং পুনিয়া, কাজাখস্তানের নিয়াজবেকভকে হারিয়ে। এই নিয়ে টোকিওতে মোট চারটে ব্রোঞ্জ জিতল ভারত। এশিয়ান গেমসে সোনাজয়ী ২৭ বছরের বজরং এদিনের বাউটে প্রথম থেকেই কর্তৃত্ব বজায় রেখেছিলেন। টেকনিক্যাল সুপিরিয়রিটিতে ৮-০ ফলে জিতলেন তিনি।

অলিম্পিক্সের আসরে সবমিলিয়ে কুস্তিতে ৭টি পদক আনল ভারত। আর টোকিওর আসরে রবিকুমার দাহিয়ার পরে দ্বিতীয় কুস্তিগির হিসেবে কুস্তিতে পদক পেলেন বজরং। প্রথম ভারতীয় কুস্তিগির হিসেবে পদক জেতেন কেডি যাদব। সেটা ছিল ১৯৫২ সালের হেলসিঙ্কি অলিম্পিক্স। এইদিনই সোনার স্বপ্নপূরণ হয় ভারতের। নীরজ চোপড়া অ্যাথলেটিক্সে অধরা সোনা এনে দেন ভারতকে। জ্যাভলিনে সোনা জেতেন তিনি। এবারের টোকিও অলিম্পিক্সের ১৫তম দিনে সোনা জিতলেন জ্যাভেলিন থ্রোয়ার নীরজ চোপড়া। প্রথম দুই রাউন্ডে ৮৭ মিটারের দূরত্ব পার করে দিয়েছিলেন নীরজ। এরপরে চতুর্থ রাউন্ডে ফাউল থ্রো করলেও তাতে কোনও সমস্যা হয়নি। দ্বিতীয় রাউন্ডে ছোঁড়া ৮৭.৫৮ মিটারের দূরত্ব আর কেউ টপকাতে পারেননি। এর আগে অলিম্পিক্সের ব্যক্তিগত ইভেন্টে সোনা জিতেছিলেন অভিনব বিন্দ্রা। ২০০৮ সালের অলিম্পিক্সে তিনি সোনা জিতেছিলেন শুটিংয়ে। তাই ভারতীয় অ্যাথলিট হিসেবে প্রথম সোনা জিতে দেশের ক্রীড়া ইতিহাসে নাম লেখালেন ২৩ বছরের নীরজ। নীরজের সোনা জয়ে টোকিও অলিম্পিক্সে ভারতের মোট পদক সংখ্যা হয় সাত।

তবে বিভিন্ন প্রতিযোগিতায় নিয়মিত সোনা জিতে আসছেন নীরজ। এর আগে নীরজ সোনা জেতেন ২০১৮-র এশিয়ান গেমসে। ওই একই বছরে তিনি সোনা জেতেন কমনওয়েলথ গেমসেও। তার আগের বছর অর্থাৎ ২০১৭ সালে নীরজ সোনা পান

ব্রোঞ্জ জয়ী ভারতীয় হকি দল

এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপ আর সাফ গেমসে। ২০১৬ সালেও তিনি দুটো সোনার পদক পান জুনিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ানশিপে আর জুনিয়ার এশিয়ান চ্যাম্পিয়ানশিপে।

পদকের খুব কাছ থেকে ফিরতে হয়েছে বেশ কিছু ইভেন্টে। তার মধ্যে ভারতীয় মহিলা হকি দল অসাধারণ খেলেছে। ব্রোঞ্জের ম্যাচে ভারতের থেকে এইরকম লড়াই বোধহয় আশা করেননি ব্রিটিশরা। রানি রামপলদের হার না মানা জেদের কাছে প্রায় হারতে বসেছিলেন তাঁরা। তাই বোঞ্জ জিতেও উচ্ছ্বাস দেখা যায়নি গত বারের সোনাজয়ী গ্রেট ব্রিটেনের মহিলা হকি খেলোয়াড়দের মধ্যে। ম্যাচ শেষে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচেন তাঁরা। এবারের অলিম্পিক্সে ভারতীয় দলের লড়াই সত্যিই অবাক করে দিয়েছে সকলকে।

গ্রুপ পর্বে প্রথম তিনটি ম্যাচ হেরেও কোয়ার্টার ফাইনালে যাওয়ার রাস্তা পাকা করেছিলেন গুরজিৎ কৌররা। সেই সময় গ্রেট ব্রিটেনের কাছেও হারতে হয়েছিল ১-৪ গোলে। কিন্তু ব্রোঞ্জের লড়াইয়ে এক সময় ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে গিয়েছিল ভারত। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। ব্রোঞ্জ জিতে নেয় ব্রিটেন। খেলার ফল ৩-৪। প্রথমবার পদক জয়ের রেকর্ড গড়ার এত কাছে এসেও খালি হাতে ফিরতে হয় রানিদের।

চলতি টোকিয়ো অলিম্পিক্সে একটা সময় পর্যন্ত গল্ফারের পদক জয়ের হাতছানি ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঙ্গালুরুর এই অ্যাথলিটের অল্পের জন্য গলফে পদক হাতছাড়া হলো। তবুও মেয়েটির লড়াকু মানসিকতার জন্য সবাই মনে রাখবে তাকে। অদিতি অশোক চতুর্থ স্থানে শেষ করলেন খেলা। যার ফলে খালি হাতেই ফিরতে হলো তাঁকে। অদিতি সকলকে চমকে দিয়ে তৃতীয় রাউন্ডের শেষে ছিলেন দ্বিতীয় স্থানে। তবে চতুর্থ রাউন্ডে সেই জায়গা ধরে রাখতে পারলেন না তিনি। যার ফলে পদক হাতছাড়া হলো তাঁর।

এবারই প্রথমবার পুরুষদের রোয়িংয়ের সেমিফাইনালে উঠেছিল ভারত। সেমিফাইনালে ছ'জনের মধ্যে ছয় নম্বরে শেষ করে অর্জুন লাল এবং অরবিন্দ সিংহ। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ছিলেন তাঁরা। দুটি সেমিফাইনাল মিলিয়ে ১২টি দেশের লড়াই হয়। প্রথম তিনটি দল সোজাসুজি পৌঁছে যায় ফাইনালে। অর্জুনরা খেলেন ফাইনাল বি। সেখান থেকে ফাইনালে যান তাঁরা। ফাইনালে প্রথম হয় স্পেন, দ্বিতীয় হয় পোল্যান্ড আর তৃতীয় হয় ইউক্রেন। পদক না পেয়ে চতুর্থ কানাডার পরে পঞ্চম স্থানে শেষ করে ভারত। প্রথম বার রোয়িংয়ে এটি বিরাট সাফল্য ভারতের।

এটা মনে রাখতে হবে যে প্রত্যেক খেলার জন্যই আলাদা কোচ অথবা কোচিং পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। 'খেলো ইন্ডিয়া' প্রকল্প চালু হওয়ার পর খেলোয়াড়দের আর এদিক-ওদিক ঘোরার প্রয়োজন হয়নি। তাই, তারা শুধু নিজের নিজের খেলাতেই মননিবেশ করতে পেরেছেন।

(লেখক বিশিষ্ট ক্রীড়াসাংবাদিক)

মিলখা থেকে ঊষা হয়ে নীরজ

মানস পাল

পৃথিবীর প্রাচীনতম ক্রীড়াযজ্ঞ অলিম্পিক খেলার আসর। যুগের পর যুগ ধরে পৃথিবীর খেলার ঐতিহ্য বহন করে চলেছে এই অলিম্পিক গেমস। খ্রিস্টপূর্ব ৮০০ শতকে যার প্রচলন শুরু প্রাচীন গ্রিসের অলিম্পিয়া থেকে। সেই পথ চলা শুরু এই খেলার আসরের, যা প্রাচীন অলিম্পিক নামে পরিচিত। তারপর কাল পরিবর্তনের নিয়মে এই খেলারও বিপুল পরিবর্তন ঘটে। এবং ১৮৯৬ সালে প্রথম আধুনিক অলিম্পিক অনুষ্ঠিত হয় গ্রিসের এথেন্স শহরে। যেখানে ১২টি দেশের ২৮০ জন খেলোয়াড় ৪৩ রকম খেলার বিভাগে অংশগ্রহণ করে। চার বছর অন্তর এই অলিম্পিকের আসর অনুষ্ঠিত হয় পৃথিবীর নানান দেশের শহরে। ফুটবল বিশ্বকাপ, হকি বিশ্বকাপ, রাগবি বিশ্বকাপ, ক্রিকেট বিশ্বকাপ, ইউরোকাপ, এশিয়াড টেনিস গ্রান্ডস্ল্যাম, ফরমূলাওয়ান, এরকম বহু বড়ো বড়ো খেলার আয়োজন পৃথিবী জুড়ে হয়। কিন্তু এসবের কোনো কিছুই অলিম্পিকের খ্যাতি জৌলুসের কাছে কিছু না। অলিম্পিকে শুধুমাত্র অংশগ্রহণ করতে পারাই যেন একজন ক্রীড়াবিদের কাছে স্বপ্নের মতো ব্যাপার। আর সেখানে একটি পদক জয় যেন তাঁকে ক্রীড়াজগতে মহান করে তোলে। অবশ্যই তাঁর দেশকেও গর্বিত করে এই সাফল্য।

এবারের অলিম্পিকের আসর বসেছিল জাপানের টোকিয়ো শহরে, যেটি ২০২০-তে অনুষ্ঠিত হওয়ার ছিল, কিন্তু করোনা অতিমারীর পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন এই খেলার আসরটি এক বছর পিছিয়ে দিয়ে ২০২১-এ করার সিদ্ধান্ত নেয়। যা এবছর টোকিয়োতে অনুষ্ঠিত হলো। এবছরেই অলিম্পিকে পৃথিবীর ২০৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে সবমিলিয়ে ১০,৩০৫ জন খেলোয়াড় অংশ নিয়েছিলেন। সর্বাধিক ৬১৩ জন খেলোয়াড় ছিলেন শুধুমাত্র ইউএসএ থেকেই।

অলিম্পিকে আমাদের দেশ ভারত প্রথম অংশগ্রহণ করে স্বাধীনতার পূর্বে ১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকে। এবং সেবার মাত্র একজন প্রতিনিধি ছিলেন— নরম্যান প্রিচার্ড অ্যাথলেটিক হিসেবে। তিনি দুটি রৌপ্য পদক জয় করেন। এরপর ১৯২০ সালে ভারত প্রথমবার অলিম্পিকে ক্রীড়াবিদের দল পাঠায়। সেই যাত্রা শুরু হয় ভারতের এবং তার পর থেকে প্রতিবার অংশগ্রহণ করে। মাঝে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের জন্য এই খেলার আসর কিছু সময় স্থগিত রাখা হয়েছিল, অবশ্য, পরবর্তী সময়ে আবার চালু হয়।

পৃথিবীর প্রায় সমস্ত দেশ অংশগ্রহণ করে এই খেলায় কিন্তু সাফল্যের নিরিখে শুধুমাত্র কয়েকটি দেশ বরাবরের মতোই শীর্ষ তালিকায় থেকে যায়। যেমন ইউএসএ চীন, জাপান, রাশিয়া এই দেশগুলোর সাফল্য সত্যিই অন্য অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর কাছে ঈর্ষার বিষয়। ভারতের প্রথম অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয় ১৯২৭ সালে। এবং তারপর থেকে এই আসরে ভারতের উল্লেখযোগ্য সাফল্য হলো হকি খেলায়। ১৯২৮ থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে পরপর ৬ বার সোনা জয় করে ভারত এই হকি খেলায়। যা ভারতের খেলার ইতিহাসের হকির স্বর্ণময় যুগ হিসেবে গণ্য করা হয়। কিন্তু ভারতের মতো এতো সুবিশাল দেশের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিভাগের সাফল্য

লভলিনা বরগোঞাই

লভলিনা বরগোঞাই একজন ভারতীয় বক্সার যিনি ২০২০ গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক টোকিয়োতে ব্রোঞ্জ পদক জিতেছেন। ২৩ বছরের জীবনে লভলিনা বহু আত্মত্যাগ করে ফেলেছেন যে কারণেই হয়তো টোকিয়ো-র মঞ্চে সাফল্য পেয়েছেন। আত্মত্যাগ ছাড়া বোধহয় বড়ো সাফল্য পাওয়া যায় না।

ভারতে ফিরে লভলিনা বলেছেন 'পরিবারের থেকে আট বছর দূরে ছিলাম। পরিবারের সমস্যার সময়ে পাশে থাকতে পারিনি।' তিনি আরও বলেন, 'এছাড়াও আমার বয়সে অনেক ভালো লাগা থাকে। সেগুলো আমাকে ত্যাগ করতে হয়েছিল। যেমন, ফাস্টফুড খাওয়া একদম বন্ধ করে দিয়েছিলাম। এবং গত আট বছর ধরে আমি ট্রেনিং থেকে কোনো ছুটি নেওয়ার কথা ভাবিনি। টানা আট বছর ধরে প্রতিটি দিন ট্রেনিং করেছি।'

তাঁর এই আত্মত্যাগের জন্যই হয়তো টোকিয়োতে তিনি সাফল্য পেয়েছেন। এখন টোকিয়োকে ভুলে নতুন লড়াই শুরু করতে চান লভলিনা। তাঁর পরের লক্ষ্য প্যারিস। পরের বার আর ব্রোঞ্জ নয়, তিনি সোনা জয়ের স্বপ্ন দেখছেন।

কোনোদিন ধারাবাহিকভাবে উচ্চপর্যায়ে পৌঁছায়নি। অ্যাথেলেটিক্স বিভাগে আমাদের দেশের প্রতিনিধিরা কোনোদিন পদক জয় করতে পারেনি। সেই দীর্ঘদিনের ব্যার্থতার খরা কাটল এই এবারের ২০২১-এ টোকিয়ো অলিম্পিকে। এর আগে রোম অলিম্পিকে ১৯৬০ সালে মিলখা সিং ৪০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থস্থানে শেষ করেন এবং ১৯৮৪ সালে লসএঞ্জেলাস অলিম্পিকে পিটিউষা ৪০০ মিটার দৌড়ে চতুর্থ স্থানে শেষ করেন।

এরপর ২০০০ সালের সিডনিতে ভারত একটি সিলভার জয় করে। ২০০৪-এ এথেন্সে একটি করে সিলভার এবং ব্রোঞ্জ জয় করে ২০০৮-এ বেজিং-এ রাইফেল শ্যুটার অভিনববিন্দ্রা সোনা জয় করেন। ২০১২-এ লন্ডনে দুটি সিলভার, চারটি ব্রোঞ্জ, ২০১৬-তে রিওতে একটি সিলভার, একটি ব্রোঞ্জ জয় করে আমাদের দেশ। যদিও ব্যক্তিগত বিভাগে প্রথমবার ভারতের হয়ে কে.ডি. যাদব পদক জয় করেন এবং এবারের ২০২১-এর আসরে ভারত প্রথমবার সর্বাধিক ৭টি পদক অর্জন করলো, এর আগে ২০২২-তে ৬টি পদক জয় করেছিল। সব হিসেব করলে আজ পর্যন্ত ভারত মোট ৩৫টি অলিম্পিক পদক (সোনা ১০, রুপো ৯, ব্রোঞ্জ ১৬) জয়লাভ করেছে।

২০২১-এর টোকিয়ো অলিম্পিক এক বিশেষ কারণে আলাদা মাত্রা পেয়েছিল শুধুমাত্র কোভিড-১৯-এর কারণে, প্রায় শূন্য দর্শক আসনে এবারের খেলার আয়োজন করা হয়েছিল। একমাত্র উত্তর কোরিয়া ছাড়া পৃথিবীর সব দেশ মিলে ২০৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। ভারত থেকে এবার ১৫৭ জন খেলোয়াড় (১০৫ জন পুরুষ, ৫২ জন মহিলা) অংশগ্রহণ করেন।

ঐতিহ্যশালী হকির দেশ ভারত। আর ক্রিকেটকে এদেশ প্রায় ধর্ম হিসেবে পালন করে। দেশটা যেন খেলাধূলার ক্ষেত্রে দিনেদিনে ক্রিকেট সদস্য হয়ে

বজরং পুনিয়া

বজরং পুনিয়া একজন ভারতীয় ফ্রিস্টাইল কুস্তিগীর। অলিম্পিক গেমস টোকিয়ো ২০২০-র গেমসে পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৬৫ কোজি বিভাগে কুস্তিতে ব্রোঞ্জ ২০১৮ কমনওয়েলথ গেমস, গোল্ড কোস্টে তিনি ৬৫ কেজির ফ্রিস্টাইল বিভাগে স্বর্ণপদক জিতেছেন।

বজরং পুনিয়া ভারতের হরিয়ানা রাজ্যের ঝাজ্জর জেলার খোদান গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর বয়সে কুস্তি লড়া শুরু করেন এবং তার পিতা এবং পরিবারের সকলে তাকে কুস্তি শিখতে উৎসাহিত করেন। ২০১৫ সালে ভারতে স্পোর্টস অথরিটি অব ইন্ডিয়ার আঞ্চলিক কেন্দ্রে যোগ দেওয়ার জন্য তার পরিবার সোনিপাতে চলে যান। ২০১৩ সালে নিউ দিল্লিতে পুরুষদের ফ্রিস্টাইল ৩০ কেজি বিভাগে বজরং ব্রোঞ্জ পদক পান। ২০১৭ মে মাসে দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান রেস্টলিং চ্যাম্পিয়নশিপে বজরং স্বর্ণপদক জিতেছিলেন। তিনি ২০১৫ সালে অর্জুন পুরস্কারে সম্মানিত হন।

রবি কুমার দাহিয়া

রবি কুমার দাহিয়া, যিনি রবি কুমার নামেও পরিচিত। একজন ভারতীয় ফ্রি স্টাইল কুস্তিগীর। ২০১৫-র বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ৫৭ কেজি বিভাগে একটি ব্রোঞ্জ পদক অর্জন করেন। ২০২০ সালের এশিয়ান রেসলিং চ্যাম্পিয়ানশিপে নয়াদিল্লিতে স্বর্ণ পদক অর্জন করেন। এবার টোকিও অলিম্পিকে রুপো জিতেছেন ।

দাহিয়া ১৯৯৭ সালে জন্মগ্রহণ করেন এবং হরিয়ানার সোনিপাত জেলার নাহরি গ্রামে বেড়ে উঠেন। দশ বছর বয়স থেকেই দাহিয়া উত্তর দিল্লির ছাত্রমাল স্টেডিয়ামে সাতপাল সিংহের কাছ থেকে প্রশিক্ষণ নেওয়া শুরু করেন। তার বাবা রাকেশ দাহিয়া একজন কৃষক যিনি ভাড়ায় ধানের জমিতে কাজ করতেন। কুস্তির খাবারের অংশ হিসেবে তিনি এক দশকেরও বেশি সময় ধরে দুধ ও ফলমূল পৌঁছে দেওয়ার জন্য প্রতিদিন নাহরি থেকে স্টেডিয়ামে যাতায়াত করতেন। ২০১২ সালে দাহিয়ার বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে আত্মপ্রকাশ করেন।

প্রথমবার অলিম্পিকের সেমিফাইনালে ভারতীয় মহিলা হকি দল।

যাচ্ছে সেখানে অ্যাথেলেটিকরা ব্রাত্য। হয়তো তারা নিজেরাই খেলার মানকে সেই উচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতেও ব্যর্থ হচ্ছেন। জাতীয় ক্ষেত্রে এমনকী এশিয়াডেও ভালো করলেও অলিম্পিকের মতো মেগাআসরে সাফল্য আসছে না, সরকার আজকাল দেশের ক্রীড়াপরিকাঠামোর ওপর যথেষ্ট যত্ন নিচ্ছে এবং ক্রীড়া বাজেটে ব্যয় বরাদ্দও বৃদ্ধি করা হচ্ছে প্রতি বছর। ২০২১-২২-এ দেশের ক্রীড়া বাজটে ছিল ২৫৯৬.১৪ কোটি টাকা। এবারের সাফল্য একটু অন্যরকমের ছিল, কারণ ২০০৮-এ অভিনব বিন্দ্রা শুটিংয়ে সোনা জিতলেও ট্রাক অ্যান্ড ফিল্ডে কোনো অ্যাথলেটিকের সোনা জয় এই প্রথম। কারণ অলিম্পিকের একটি সোনা সকলের কাছেই এক বহুকাঙ্ক্ষিত বিষয়।

ভারতীয় সেনার সুবেদার পদের ২৩ বছরের নীরজ চোপড়া এবার দেশের জন্য ইতিহাস গড়লেন। হরিয়ানার অধিবাসী নীরজ জ্যাভলিন (বর্শা ছোঁড়া) থ্রোয়িংয়ে প্রথম স্থান অধিকার করেন ৮৭.৫৮ মিটার দূরত্ব থ্রো করে। এটি তাঁর নিজের এবং দেশের জন্য দারুণ অনুভূতির ব্যাপার অবশ্যই। ভারতের ক্রীড়াক্ষেত্রে বিশেষ করে ট্র্যাক অ্যান্ড ফিল্ডে তিনি হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা আজ। ভারত্তোলক মীরাবাঈ চানু ৪৯ কেজি বিভাগে সিলভার জয় করেন। রবিকুমার দাহিয়া ৫৭কেজি বিভাগে কুস্তিতে সিলভার জয় করেন।

হকিতে পুরুষ হকিদল জার্মানকে হারিয়ে ব্রোঞ্জ জয় করে। ব্যাডমিন্টনে পি.ভি. সিন্ধু বি.জে.হেকে হারিয়ে (২১-১৩, ২১-১৫) ব্রোঞ্জ জেতেন। কুস্তিতে বি. পুনিয়া ব্রোঞ্জ জয় করেন ৬৫ কেজি বিভাগে। মহিলা বক্সার লাভলিনা ব্রোঞ্জ জয় করেন বোর্গহাইনকে হারিয়ে। এই ছিল এবারের অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যের খতিয়ান।

মহিলা হকি দল অল্পের জন্য ব্রোঞ্জ পদকটি জয় করতে না পারলেও দেশে ক্রীড়াপ্রেমীদের মনজয় করে নিয়েছে বিশেষ করে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এতো ব্যস্ততার মধ্যেও এদেশের এই পরিস্থিতির মধ্যেও সরাসরি যোগাযোগ রেখেছিলেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে। ভিডিয়ো কলের মাধ্যমে সারা বিশ্ব সেই আবেগপূর্ণ দৃশ্যগুলো প্রত্যক্ষ করেছে। এবারের আসরে যথারীতি ইউএসএ ৩৯টি সোনা-সহ ১১৪টি পদক নিয়ে তালিকায় শীর্ষ স্থানেই রয়েছে। চীন ৩৮টি সোনা-সহ ৮৮টি পদক নিয়ে দ্বিতীয় এবং জাপান ২৭টি সোনা-সহ ৫৮টি পদক নিয়ে তৃতীয় স্থান দখল করেছে। এবং ভারত ৪৮তম স্থানে শেষ করেছে।

এবারের অলিম্পিকে ভারতের সাফল্য যথেষ্টই ইতিবাচক বলেই গণ্য করা উচিত। এই ভাবে সাফল্যের দৃষ্টান্তই আগামীদিনের সফল হওয়ার রাস্তা নির্ণয় করবে।

(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং গবেষক)

অলিম্পিকে ভারতের সাফল্যে কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকা প্রশংসনীয়

রাজীব চক্রবর্তী

অমরত্বের চলমান ইতিহাস। বিশ্বক্রীড়া মানচিত্রে এটাই অলিম্পিকের যথাযথ মূল্যায়ন। পাঁচ মহাদেশের একসঙ্গে শুধু মিলে যাওয়াই নয়, চরম আভিজাত্যের অহংকার থেকে আমার আপনার মতো আম আদমি হয়ে ওঠার শিক্ষাও যে অলিম্পিকই দিয়েছে। বিশ্বের সফলতম ক্রীড়াবিদ অখ্যাত কোনো সাধারণ ক্রীড়াবিদের সঙ্গে এক টেবিলে মধ্যাহ্নভোজ সারছেন এই দৃশ্য বিশ্বের আর কোনও ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় দেখাটা শুধু অকল্পনীয় নয় অবাস্তবও বটে, আর এখানেই অলিম্পিকের সার্থকতা।

আপনি যত বড়ো তারকাই হোন না কেন অলিম্পিকের দরবারে আপনি আর সবার মতো একজন সাধারণই। বিশ্বের দরবারে আপনার যত বড়ো তারকা ইমেজই থাক না কেন গেমস ভিলেজে আপনি সেই পথের পাঁচালির নিশ্চিন্দিপুরের বাসিন্দা হয়েই থাকবেন। একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে আসি, অলিম্পিকের ইতিহাসে এবারই সবথেকে ভালো ফল করেছে ভারত। ১টি সোনা, ২টি রুপো ও ৪টি ব্রোঞ্জ পদক পেয়ে ক্রমতালিকায় এবার বিশ্বের প্রথম ৫০টি দেশের মধ্যে নিজেদের জায়গা করে নিয়েছে ভারত। এই কৃতিত্বের পিছনে ক্রীড়াবিদদের অক্লান্ত পরিশ্রম ও নিষ্ঠা তো রয়েছেই। অস্বীকার করা যাবে না কেন্দ্রীয় সরকারের ইতিবাচক প্রয়াসের দিকটিও। অলিম্পিকে ভালো ফল করার জন্য এবার অনেক আগে থেকেই উদ্যোগ নিয়েছিল কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। শুধু আর্থিক দিক নয়, ক্রীড়াবিদদের যাবতীয় সুখ-সুবিধার জন্য কোনও রকম কার্পণ্য করেননি তারা। তাই এই সাফল্যের পিছনে ক্রীড়াবিদদের পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের ভূমিকাকেও কোনও ভাবে অস্বীকার করা যাবে না। একটি অলিম্পিক পদক একজন ক্রীড়াবিদের জীবনে কতখানি গুরুত্ব পায় তার উজ্জ্বলতম নিদর্শন সার্বিয়ান টেনিস তারকা নোভাক জকোভিচ। কুড়িটি গ্র্যান্ডস্লাম খেতাবের অধিকারী এই সার্বিয়ান তারকা ইতিমধ্যেই নিজেকে কিংবদন্তীর পর্যায়ে নিয়ে গেছেন। এবারের অলিম্পিকে তিনি এসেছিলেন সোনার পদক জয়ের লক্ষ্যে কিন্তু তাঁর সেই স্বপ্ন পূরণ তো দূরের কথা ব্রোঞ্জ পদকও জিততে ব্যর্থ তিনি। শুধু তাই নয়, ব্রোঞ্জ পদকের লড়াইয়ে হেরে যাবার পর হতাশায় নিজের র‍্যাকেটটা পর্যন্ত ছুঁড়ে ফেলেছিলেন তিনি। আর এখানেই অলিম্পিক গেমসের সার্থকতা। পাশাপাশি এই শিক্ষাও অলিম্পিক দিয়ে যায় যে তুমি যত বড়ো ক্রীড়াবিদই হও না কেন এখানে নিজেকে প্রমাণ করার আসল পরীক্ষাটা তোমার জন্য অপেক্ষা করে রয়েছে। যদি সফল হও গোটা পৃথিবী একবাক্যে তোমার শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে নেবে নচেৎ সব পেয়েও কিছু না পাওয়ার আক্ষেপ বয়ে বেড়াতে হবে সারাজীবন ধরে। যেমন আমৃত্যু সেই বোঝা বয়ে বেড়িয়েছেন মিলখা সিং। রোম অলিম্পিকে চতুর্থ স্থান পেয়েছিলেন 'ফ্লাইং শিখ'। এই আক্ষেপ তাঁকে আমৃত্যু তাড়িয়ে বেরিয়েছে। শুধু মিলখা সিং কেন পি.টি. উষা থেকে শুরু করে সারা ভারত একশো বছরের বেশি সময় ধরে শুধু এই একটা স্বপ্নই দেখে গেছে। অ্যাথলেটিক্সের একটা অন্তত পদক। নীরজ শুধু সেই স্বপ্নই পূর্ণ করেননি, ভবিষ্যত প্রজন্মের কাছে এমন একটা আত্মবিশ্বাসের সৌরভ ছড়িয়ে দিয়েছেন যা আগামী দেনে ভারতকে অনেক পদক এনে দেবে বিশ্বের সেরা ক্রীড়া উৎসব থেকে। ধন্যবাদ নীরজ দেশকে সেনার মুহূর্ত উপহার দেওয়ার জন্য। ধন্যবাদ নর্মান প্রিচার্ড। আপনাকেও আমরা ভুলব না। ভারতকে প্রথম অলিম্পিক অ্যাথলেটিক্সের পদক দেওয়ার জন্য। আপনি ব্রিটিশ তাই আপনার পদক জয়ের সাফল্য নিয়ে বিতর্ক রয়েছে কিন্তু অলিম্পিক ইতিহাস আপনাকে ভারতের প্রতিনিধি হিসাবেই স্বীকৃতি দিয়েছে।

মীরাবাই চানুদের কুর্নিশ জানাতে হয়। অভাব, দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করে প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে উঠে আসা এই ক্রীড়াবিদ সদ্যসমাপ্ত অলিম্পিকে এটা প্রমাণ করে দিয়েছেন, আর্থিক প্রাচুর্য না থাকলেও শুধু অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অক্লান্ত পরিশ্রম দিয়ে যাবতীয় প্রতিকুলতাকে ঢেকে দেওয়া যায়। পাশাপাশি আবারও বলতে হবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশংসনীয় ভূমিকার কথা। এইসব প্রতিভাকে বিশ্বমঞ্চে তুলে ধরার জন্য তারা যেভাবে সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছেন তার জন্য কোনও প্রশংসাই তাদের জন্য যথেষ্ট নয়। এই ইতিবাচক মনোভাব অক্ষুণ্ণ থাকলে আগামীদিনে পদক তালিকায় ভারত যে অনেক এগিয়ে যাবে সে ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই। শুধু অর্থই নয়, সাফল্যের জন্য ইতিবাচক পরিকল্পনাও অত্যন্ত জরুরি। চীন, জাপান, কোরিয়ার এই দারুণ সাফল্যের পিছনে রয়েছে দুরন্ত পরিকল্পনা। তৃণমূল স্তর থেকে প্রতিভা খুঁজে না বার করলে সার্বিক উন্নতি কখনই সম্ভব নয়। ভারতের বিভিন্ন ক্রীড়াসংস্থার কর্তাদের এ ব্যাপারে আন্তরিক উদ্যোগী হতে হবে। নীরজের সোনা জয়ে দেশ জুড়ে যে উন্মাদনা শুরু হয়েছে সেটা যেন এখানেই শেষ না হয়। টোকিয়ো ভুলে এখন লক্ষ্য প্যারিস। মুষ্টিমেয় কয়েকটি বিভাগ থেকে নয়, নজর দিতে হবে সব বিভাগেই যাতে আরেকটি সোনার পদকের জন্য আমাদের বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে না হয়। *(লেখক বিশিষ্ট সাংবাদিক)*

অলিম্পিকের নায়ক থেকে সিনেমার খলনায়ক

অনামিকা দে

পুরনো হিন্দি চলচ্চিত্র 'করিশমা কুদরত কা'-এর সেই কুখ্যাত খলনায়ক 'শেঠ জানকী লাল' বা মনে করুন 'খেল খেল মে'-এর সেই ঘনশ্যাম চরিত্রটি, মনে পড়লে এখনও বেশ বিরক্তিভরা অনুভূতি হয়— কারণ অভিনেতার ১০০ শতাংশ পারদর্শিতা। খলনায়কের চরিত্র সিনেমার পর্দায় ফুটিয়ে তোলা সেই মুখটি জানকী দাস মেহেরার। তবে এই মানুষটির গুণপনার আরও যেসব দিক আছে তাতে তার প্রতি শ্রদ্ধায় মাথা নত করতে হবে আমাদের।

জানকীদাস মেহেরা ছিলেন ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতের একজন বিখ্যাত অভিনেতা। একইসঙ্গে প্রেডাকশন ডিজাইনার। তিনি ১৯৩০ থেকে ১৯৭৭ পর্যন্ত হিন্দি সিনেমার জগতে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। হাজারের বেশি সিনেমাতে অভিনয় করে দর্শকের মনোরঞ্জন করেছেন তিনি। চরিত্রের দাবি অনুযায়ী পর্দায় ভিলেনের ভূমিকা এমনভাবে পালন করতেন তিনি যে মানুষের মনে ঘৃণা তৈরি হতো। এখানেই বোধহয় জাত অভিনেতার সার্থকতা। ১৯৪১ সালে 'খাজাঞ্চী' চলচ্চিত্রে প্রথম বড়ো ভূমিকায় তাঁকে অভিনয় করতে দেখা যায়। ১৯৪৬ পর্যন্ত তাঁকে ফিল্ম দুনিয়ায় দেখা যায়নি। এরপর 'ড. কাটনিস কি অমর কাহিনি'তে আবার তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। তারপর থেকে চলচ্চিত্র জগতে তাঁর ধারাবাহিক যাত্রা শুরু। প্রোডাকসন ডিজাইনার হিসেবে জানকীদাস বহু বিশিষ্ট চলচ্চিত্র তারকাকে খুঁজে বের করেছিলেন। এদের মধ্যে রয়েছেন, 'দৌলত'-এর মধুবালা, 'হামারা ঘর'-এর মীনা কুমারী বা 'দরদ্ কা রিস্তা'-এর খুশবু। কিশোর সাহুর প্রযোজনা ও

পরিচালনায় তৈরি 'হ্যামলেট' চলচ্চিত্রে মালা সিনহাকে আত্মপ্রকাশ করতে সাহায্য করেন জানকীদাস। ১৯৮৫ সালে জানকীদাস 'ইয়াদো কি কসম' চলচিত্রের স্ক্রিপ্ট রচনা করেন।

জানকীদাস মেহেরা বহু ন্যাশনাল ও ইন্টারন্যাশনাল পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। ১৯৯৬-এর মে মাসে উনি 'লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট আওয়ার্ড' পেয়েছেন ইন্ডিয়ান মোশান পিকচারস প্রোডিউসার'স অ্যাসোসিয়েশানের পক্ষে থেকে।' এই মানুষটিই যে একজন বিশ্বখ্যাত অলিম্পিয়ান সে বিষয়ে কিন্তু আমরা অনেকেই অবগত নই। জানকীদাস মেহেরা ছিলেন একমাত্র ভারতীয় যিনি ১৯৩৬ সালের অলিম্পিক গেমস-এর ইন্টারন্যাশনাল অলিম্পিক কমিটির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। জানকীদাস একমাত্র ভারতীয় যিনি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙেছিলেন 'Olympic Cycling'-এ। ১৯৩৪ এবং ১৯৪২-এ অলিম্পিক গেসসে উনি বিশ্ব রেকর্ড গড়েন।

১৯৩৬-এ জানকীদাস বার্লিনে আয়োজিত অলিম্পিক গেমসে জিতেছিলেন আরেকটি বিশ্ব রেকর্ড ভেঙে কিন্তু সেই স্মরণীয় সাইক্লিং রেসটি শেষ করার মুহূর্তে তিনি স্বাধীনতা সংগ্রামীদের ব্যবহৃত ভারতমাতার পতাকা তুলে ধরেন। এই ঔদ্ধত্য দেখানোর জন্য তাঁকে গেমস থেকে disqualified করা হয় এবং তাঁকে প্রথম পুরস্কারের মেডেলটি থেকে বঞ্চিত করা হয়। ১৯৪২ সাল, জানকীদাস ভারতমায়ের এই প্রকৃত সন্তান দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে আরও একবার বিশ্ব রেকর্ড ভাঙতে অলিম্পিকের ময়দানে নামেন এবং বিশ্বরেকর্ড করেন। তিনি মনে করতেন অলিম্পিকের ময়দান থেকে চলে যাওয়া মানে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার সংগ্রাম থেকে সরে যাওয়া। দেশভক্তির কী জ্বলন্ত উদাহারণ রখে গিয়েছেন জানকীদাস। তিনিই সেই পথ-প্রবর্তক যিনি মূলত ১৯৪০-এ 'সাইক্লিং ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া' স্থাপন করেন।

জানকীদাস জন্মেছিলেন ব্রিটিশ ভারতের লাহোরে ১৯১০ সালে। ২০০৩-এর ১৮ জুন মুম্বাই-এর জুহূতে তাঁর নিজের বাসভবনে হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান।

ব্রিটিশদের নাকের ডগায় দাঁড়িয়ে ভারতমায়ের এই অকুতোভয় বীর যে বার্তা দিয়েছিলেন ভারতের বুকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে তা নাড়িয়ে দিয়েছিল। আজ স্বাধীনতার ৭৫তম বছরে পদার্পণ করে ভারতমায়ের বীরসন্তান প্রকৃত নায়ক জনকীদাস মেহেরাকে জানাই অন্তরের 'স্যালুট'।

অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মুখোমুখি বাঙ্গলার তাঁতশিল্প

শুক্লা সিকদার

তাঁতের শাড়ি হলো বাঙ্গলার এবং অধুনা পশ্চিমবঙ্গের একটি ঐতিহ্যবাহী আরামপ্রদ শাড়ি। ভারতীয় উপমহাদেশের পূর্ব অংশে বঙ্গীয় অঞ্চল থেকে উদ্ভূত এই শাড়ি বাঙ্গালির সংস্কৃতি ও কৃষ্টির সঙ্গে বিশেষ ভাবে যুক্ত। বর্তমানেও এই শাড়ি পরার প্রচলন বাঙ্গালি মহিলাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি। তাঁতের শাড়ির বুননশিল্পীদের তাঁতী বলা হয়। উদ্ভবের সময়কাল থেকেই এই শাড়ি সব থেকে বেশি তৈরি হয় পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও অসমের বরাক উপত্যকায়। নদিয়া, মুর্শিদাবাদ তাঁত শাড়ি বুননের জন্য বিখ্যাত। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের গ্রামেগঞ্জে সমবায় ভিত্তিক কুটির শিল্প হিসেবে তাঁতশিল্পের অস্তিত্ব রয়েছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে বংশানুক্রমিক তাঁতীর নিজস্ব উদ্যোগেও তাঁত শিল্প চলছে। স্থানীয় তাঁতশিল্পের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘরানার প্রচলনও দেখা যায়। বাঁকুড়ার বিষ্ণুপুরের তাঁতী সম্প্রদায় আজ সেরকমই একটি ঘরানার সাক্ষ্য বহন করে চলেছেন।

তাঁতের শাড়ি মূলত কার্পাস তুলার সুতো থেকে বোনা হয়। তাঁতের শাড়ি তার স্বচ্ছতার জন্য অন্যান্য শাড়ির থেকে আলাদা। ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তপ্ত এবং আর্দ্র আবহাওয়ার জন্য তাঁতের শাড়ি সবচেয়ে আরামদায়ক শাড়ি হিসেবে বিবেচিত হয়।

পনেরো শতকের অবিভক্ত বাঙ্গলায় তাঁতের শাড়ি বুননের প্রথম রেকর্ডটি পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান নদীয়া জেলার শান্তিপুরে পাওয়া যায়। সুতরাং বর্তমানে ভারতবর্ষ ও বাংলাদেশের তাঁত শিল্প পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গলায় উদ্ভূত সেরা এবং প্রাচীন বুনন কৌশলটির প্রতিনিধিত্বকারী।

তাঁত, জামদানি ও মসলিন একই শ্রেণীভুক্ত শাড়ি হওয়ার সুবাদে জামদানি ও মসলিনের পাশাপাশি তাঁত মুঘল যুগে পশ্চিমবঙ্গের মুর্শিদাবাদ এবং বাংলাদেশের ঢাকার আশেপাশে বিখ্যাত হয়ে ওঠে। ষোড়শ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাঙ্গলার তাঁতশিল্প মসলিন ও জামদানির শ্রেণীভুক্ত হয়ে অভূতপূর্ব রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পেয়েছিল। পরবর্তীকালে দেশীয় শিল্পের বিনাশকারী ব্রিটিশ সরকার ম্যানচেস্টারের টেক্সটাইল শিল্পকে সুরক্ষিত করার জন্য মসলিন ও জামদানির পাশাপাশি তাঁতশিল্পকেও ধ্বংস করার চেষ্টা করেছিল, কিন্তু শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও মূলগত তাঁত সংস্কৃতি টিকে থাকতে সক্ষম হয়েছিল তাঁতীদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায়। ১৯৪৭-এর দেশ বিভাগের সময় বঙ্গ প্রদেশের বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে বঙ্গের তাঁতী সম্প্রদায়েরও ভৌগোলিক বিভাজন ঘটে। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুরের নিকটবর্তী ফুলিয়া অঞ্চল বাংলাদেশের টাঙ্গাইল থেকে আগত তাঁতীদের নতুন বসতিতে পরিণত হয়েছিল। বাংলাদেশের টাঙ্গাইল থেকে পুনর্বাসিত তাঁতীরা তাদের সঙ্গে তাদের পৈতৃক তাঁতের ঐতিহ্যও নিয়ে এসেছিলেন। পশ্চিমবঙ্গের তাঁতী সম্প্রদায়গুলি হুগলি, নদীয়া ও বর্ধমান জেলায় বসবাসরত।

স্বাধীনতা ও দেশবিভাগ পরবর্তী শৈল্পিক মন্দার সময়েও দুই বাঙ্গলার তাঁতী

সম্প্রদায়ই শুধুমাত্র আত্মিক সংযোগ সূত্রের তাড়নায় তাঁতশিল্পকে ধারণ ও বহন করে নিয়ে তাদের কারুকাজ চালিয়ে যান। এইভাবে মূলত তাঁতীদের আত্মিক অবদানেই দুই বাংলায় তাঁতশিল্প আজও বেঁচে রয়েছে। তাঁতের শাড়ি বিশেষত বুনন ও কারুকাজের জন্য বিখ্যাত। তাঁতের শাড়ি বুননের ক্ষেত্রে তাঁতশিল্পী বা কারিগররা দক্ষতার সঙ্গে সুতোর টুকরো তাঁত করে যা তাঁত শাড়িতে বুনোটের মধ্যে ফেলা হয়। তাঁতের শাড়ি বুননের জন্য দুটি শাটল ব্যবহৃত হয়। ঐতিহ্যগতভাবে তাঁতীরা তাঁতের শাড়ি বুননের জন্য হ্যান্ডলুম ব্যবহার করতেন। যদিও সাম্প্রতিককালে তাঁতের শাড়ি বুননের বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যান্ডলুম, বিদ্যুতের তাঁত দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়েছে। যা বর্তমান সময়ে তাঁতীদের মধ্যে আবার এক অসম প্রতিযোগিতা ও গুণমানের বিভিন্নতার জন্ম দিয়েছে।

সাধারণ ভাবে তাঁতের শাড়ি ঘন সীমানা এবং আলংকারিক পল্লভ দ্বারা চিহ্নিত হয়। এছাড়াও তাঁতের শাড়ির বুননের ক্ষেত্রে বিভিন্ন ফুলের পাইসলে (line/row) এবং অন্যান্য শৈল্পিক মোটিফ ব্যবহার করা হয়। তাঁতের শাড়ির জনপ্রিয় কয়েকটি ঐতিহ্যবাহী মোটিফ হলো : ভোমরা (ভোদা মৌমাছি), তাবিজ (তাবিজ), রাজমহল (রাজপ্রসাদ), অর্ধচন্দ্র (অর্ধচন্দ্র), চান্দমালা (চাঁদের মালা), আঁশ (ফিশ স্কেল), হাতি (হাতি), নীলাম্বরী (নীল আকাশ), রতন চোখ (রত্নচক্ষু), বেনকি (সর্পিল), তারা (তারা), কলকা (পাইসলে) এবং ফুল (ফুল)। মুদ্রিত, হাতে আঁকা এবং সূচিকর্মের নিদর্শনগুলিও বিভিন্ন ধরনের ডিজাইনের জন্য ব্যবহার করা হয়। তবে সম্প্রতি ফুলের উপাদান, সৌর উপাদান এবং এমনকী আধুনিক শিল্পসম্মত বিভিন্ন নকশা এই শাড়িতে চিত্রিত হচ্ছে। তবে তাঁতের শাড়ির বিশেষত্ব হলো শাড়ির রঙিন ডিজাইন, ঘন সীমানা এবং গ্রামবাঙ্গলার সংস্কৃতির সঙ্গে একাত্মতা।

বৈচিত্র্যময় তাঁতের শাড়ির সেরা বৈচিত্র্য হিসেবে বিবেচিত জামদানি শাড়ির বুননের ঐতিহ্যবাহী শিল্পকে ইউনেস্কো একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য হিসেবে তালিকাভুক্ত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ-সহ সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে থাকা বাঙ্গালি নারীদের পাশাপাশি অনেক বিশিষ্ট নারীও তাদের নিয়মিত পোশাক হিসেবে তাঁতের শাড়ি পরতে পছন্দ করেন।

তবে ঐতিহ্যবাহী শিল্প হওয়া সত্ত্বেও বিগত কয়েক শতক ধরেই তাঁতশিল্প যেন প্রতিনিয়ত তার জায়গা হারাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে খাদি শিল্পকে নিয়ে সরকার ও প্রশাসনের বিশেষ উদ্যোগ নজর কাড়লেও স্বাধীনোত্তর সময়ে তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য সরকারি কিংবা প্রশাসনিক উদ্যোগ তাঁত শিল্পকে ঘিরে নেওয়া হয়নি। বিগত কয়েক দশকে অপ্রতুল সরকারি উদ্যোগ, মূলধনের জোগানের অভাব, সাংগঠনিক সমন্বয় ও আধুনিক সৃজনশীলতার অভাব নবীন প্রজন্মকে তাঁতশিল্প থেকে অনেকটাই দূরে সরিয়ে নিয়ে গেছে। ফলস্বরূপ পশ্চিমবঙ্গের তাঁতশিল্প আজ অনেকটা প্রাচীনত্বের কারাগারে বন্দি হয়ে পড়েছে। তার উপরে করোনা পরবর্তী বস্ত্রশিল্পের মন্দার বাজারে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্প প্রভূত ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। করোনাজনিত ব্যবসায়িক মন্দার কারণে পশ্চিমবঙ্গে বহু তাঁত সমবায়ের অস্তিত্ব আজ বিলুপ্ত হওয়ার পথে। বংশানুক্রমিক ভাবে তাঁতশিল্পের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহকারী বহু তাঁতী আজ জীবনধারণের জন্য অন্য পেশা অবলম্বন করতে একরকম বাধ্য হয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের শান্তিপুর, ফুলিয়া, নদিয়া এবং ধনিয়াখালির তাঁতী সম্প্রদায়ের তাঁতীপাড়া আজ অনেকটাই নিস্তব্ধ। মহামারী পরবর্তী সময়ে তাঁতশিল্পের পুনরুজ্জীবনের জন্য তাঁতীকুল আজ পথ হাতড়াচ্ছে। অন্য পেশায় স্থায়ীভাবে নিযুক্ত হয়ে গেলে হয়তো তারা জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকবেন কিন্তু হারিয়ে যাবে বাঙ্গলার তাঁতীদের শতাব্দীলালিত তাঁত শিল্প। পশ্চিমবঙ্গের তাঁতী সম্প্রদায় আজ সেই ঐতিহ্যবিচ্যুতির দ্বারপ্রান্তেই রয়েছেন। তাদেরও হৃদয়ে রয়েছে বংশানুক্রমিক তাঁতশিল্পকে ধরে রাখতে না পারার গ্লানি, পৃষ্ঠপোষকতা না পাওয়ার অভিমানও।

তথ্যানুসন্ধান করতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পের পুনরুজ্জীবনে মূলধনের জোগান, যুবশ্রম, উদ্ভাবনী শক্তি ও অভিনবত্ব সমৃদ্ধ কর্মবৃত্তই সম্ভাব্য প্রধান অনুঘটক হিসেবে উঠে এসেছে। প্রথমত, মূলধনের জোগান নিশ্চিত করে পশ্চিমবঙ্গের তাঁত শিল্পকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচাতে কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ একান্ত প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত ভারতবর্ষে যেখানে ৬৫ শতাংশ মানুষ ২৫ বছরের কম বয়স্ক এবং ভারত যেখানে বিশ্বের যুবসমৃদ্ধ দেশগুলির মধ্যে অন্যতম সেখানে ভারতের তথা পশ্চিমবঙ্গের যুবসমাজের মধ্যে তাঁতশিল্পের আগ্রহ বৃদ্ধি হলে তা সবদিক থেকেই সহায়ক হবে বলে আশা করা যায়। বিশ্বব্যাপী তাঁতশিল্পের চাহিদার বৃদ্ধি হলে কর্মসংস্থানেও তা বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারে।

অন্যদিকে অল্পবয়েসি ছেলেমেয়েরাই আবার তাঁতশিল্পে ই-কমার্স ও ডিজিটাল মার্কেটিংয়ের সংযোগ ঘটিয়ে চাহিদার জোয়ার বয়ে আনতে পারে। বস্ত্র ও শাড়ির খুচরো ও পাইকারি ব্যবসায়ীদের সঙ্গে, যুবসমাজ ও তাঁতীদের একটি সুগঠিত কর্মবৃত্তই পারে বাঙ্গলার শতাব্দীপ্রাচীন তাঁতশিল্পকে বিলুপ্তির কিনারা থেকে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে। তৃতীয়ত, তাঁতশিল্পে আধুনিক সৃজনশীলতার প্রয়োগও আজ একান্ত প্রয়োজন। তাঁতজাত দ্রব্যকে বিশ্ববাজারে জনপ্রিয় করে তুলতে এতে আনতে হবে বৈচিত্র্যের ছোঁয়া। এজন্য তাঁতীদের জন্য নিয়মিত ওয়ার্কশপের আয়োজন করাও অত্যন্ত আবশ্যক। ফ্যাশন ডিজাইনার থেকে শুরু করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বময়ী নারীরা এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা পালন করতে পারেন। ◻

রামমোহন ছিলেন বাঙ্গলার নবজাগরণের পথিকৃৎ

রাজদীপ মিত্র

আধুনিক ভারতের সমাজ সংস্কারের অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তাঁর চরিত্রে অদ্ভুত চারটি গুণের সমন্বয় হয়েছিল--- যুক্তিবাদ, সর্বজনীনতা, সহনশীলতা ও সমন্বয়ের ক্ষমতা।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর দিক থেকে পাদরিরা খ্রিস্টধর্ম প্রচার করার জন্য বেশ সচেষ্ট হয়েছিল। তারা ভাবল যদি কিছু প্রভাবশালী মানুষকে খ্রিস্টধর্মে দীক্ষা দেওয়া যায়, তবে ভারতের অনেকেই ধীরে ধীরে খ্রিস্টান হবে। অনেক প্রচেষ্টার পর পাদরিরা বুঝতে পারল যে, তারা আশানুরূপভাবে সফল হচ্ছে না। ভালো কথায় দেশের বিশিষ্টদের রাজি করানো যাচ্ছে না। কৌশল পরিবর্তন করে তারা বড়ো চাকরির লোভ দেখিয়ে, ঠুনকো সম্মান দিয়ে বড়োলোকদের কাছে টানবার চেষ্টা করলেন। এমনই একজন পাদরি ছিলেন জন মিডলটন। রামমোহনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ভালো, তাঁর বাড়িতে প্রায়দিনই ধর্মসংক্রান্ত আলোচনা হতো। রামমোহন সেখানে হিন্দুধর্মের দোষ-ত্রুটিগুলি তুলে ধরেন— সমালোচনা করেন।

এই সুযোগে মিডলটন সাহেব একদিন তাঁকে বললেন— 'আপনি নিজেই যখন বলেন যে, হিন্দুধর্মের অনেক খারাপ দিক আছে, তখন আপনি খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা নিন। আপনার অনেক টাকা পয়সা হবে, বড়ো বড়ো ইংরেজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব হবে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বড়ো পদও পাবেন, মান-সম্মান পাবেন।' এই প্রস্তাব শুনে রামমোহন বলেন— 'আমার ধর্মে যা কিছু খারাপ দিক আছে, তা আমি এই ধর্মে থেকেই সংশোধন করব, অন্য ধর্ম গ্রহণ করব না।' এই বলে ঘৃণায় তিনি মিডলটনের বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলেন। আর কোনোদিন সেখানে যাননি ও মিডলটনের সঙ্গে সম্পর্কও রাখেননি। নিজ ধর্মের প্রতি এরকমই ছিল তাঁর ভালোবাসা।

রামমোহন রায় একেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠা করার জন্য বেদান্তসূত্র ও তার সমর্থক উপনিষদগুলি বাংলায় অনুবাদ করে তিনি প্রচার করতে থাকেন। ১৮১৫ থেকে ১৮১৯ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয় বেদান্তগ্রন্থ, বেদান্তসার, কেনোপনিষদ, ঈশোপনিষদ, কঠোপনিষদ, মাণ্ডুক্যোপনিষদ ও মুণ্ডকোপনিষদ।

শ্রীরামপুরের মিশনারিদের হাত থেকে হিন্দু একেশ্বরবাদ ও বেদান্তকে বাঁচাবার জন্য রামমোহন দুটি পত্রিকা প্রকাশ করলেন। বাংলায় 'ব্রাহ্মণ সেবধি' ও ইংরেজিতে 'Brahminical Magazine।'

'ব্রাহ্মণ সেবধি' পত্রিকায় রামমোহন রায় ভারতীয় উপমহাদেশে শাসনের সুযোগ নিয়ে ইংরেজদের ধর্মান্তরকরণের বিরোধিতা করেছিলেন। রামমোহন রায়ের কর্মজীবন নিয়ে কাজ করেছেন বালকান্ত ব্রাহ্মসমাজের অমিত দাস। ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনের উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি লিখছেন— 'ব্রাহ্মনিক্যাল ম্যাগাজিনে রামমোহন রায় লিখেছিলেন : 'বাংলাদেশে যেখানে ইংরেজের সম্পূর্ণ অধিকার ও ইংরেজের নামে লোকে ভীত হয়, তথায় এরূপ দুর্বল, দীন ও ভয়ার্ত প্রজার উপর ও তাহাদের ধর্মের উপর দৌরাত্ম্য করাটা, কী ধর্মত, কী লোকত প্রশংসনীয় হয় না।'

তাঁর যুক্তিবাদী মনই তাঁকে শিখিয়েছিল--- চলে আসা যে কোনো সামাজিক নিয়মকে যুক্তির নিরিখে যাচাই না করে কখনও তা গ্রহণ করা উচিত নয়। তৎকালীন হিন্দু সমাজের প্রথা অনুযায়ী হিন্দু বিধবাদের স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় পুড়িয়ে মারার যে বিধান ছিল তা দূর করার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে প্রবল জনমত গড়ে তুলতে প্রয়াসী হন তিনি। ১৮২৯ সালে সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন পাশ হয়।

১৮৩৩ সালে ব্রিটেনের ব্রিস্টল শহরে রামমোহন মেনিনজাইটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পরলোক গমন করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহন যে মুক্ত চিন্তা চেতনার আলো জ্বেলে দিয়ে গিয়েছিলেন, সেই আলোতেই বাঙ্গলার নবজাগরণের পথটি তৈরি হয়েছিল। ▮

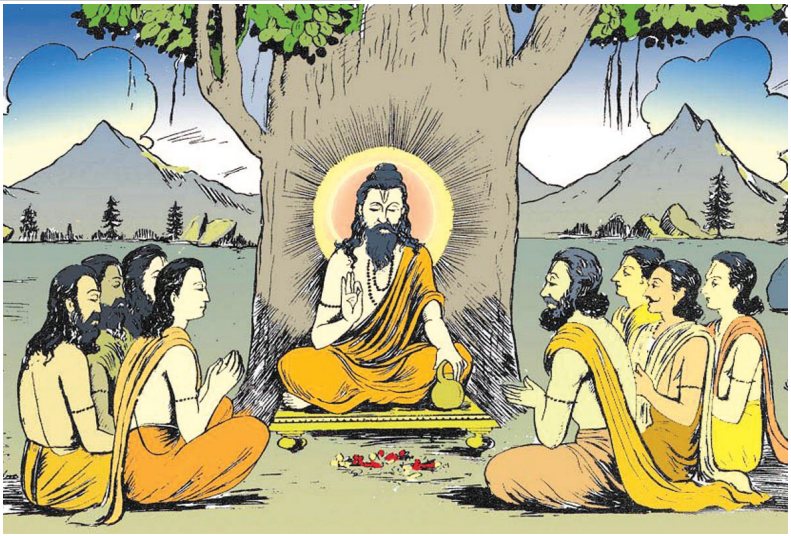

সঙ্ঘবদ্ধতা সৃষ্টির আদি তত্ত্ব

অমিত ঘোষ দস্তিদার

সৃষ্টির সমস্ত তত্ত্বই সঙ্ঘবদ্ধতার উপর আধারিত। ভারতবর্ষের সমস্ত তত্ত্বই চিরকাল এই একটা কথা বলে এসেছে। আদ্যাশক্তি কথাটাই তো সঙ্ঘবদ্ধতা। আদ্যাশক্তি অর্থাৎ সকলের আদি। সকলের আদি যে শক্তি, তাঁর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের দ্বারাই সকল দেবগণ শক্তিমান। সমস্ত দেবতা তাঁদের দেহস্থিত সেই শক্তিকেই সম্মিলিত করে মহাশক্তিকে প্রকট করে থাকেন। সংসারে, সমাজে, রাষ্ট্রে যখনই অশুভের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে, তখনই সকলকে সঙ্ঘবদ্ধ হতে হবে। মনে রাখতে হবে অশুভ শক্তির পরম শত্রুই হলো সঙ্ঘবদ্ধতা।

অশুভ শক্তি নানাভাবে জাল বিছিয়ে ভারতবর্ষের সনাতন কাল থেকে সঙ্ঘবদ্ধতাকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার প্রচেষ্টায় আজও রত। তাই এতো বিচ্ছিন্নতা। তারা তাদের পরিকল্পনায় আপাতভাবে হয়তো অনেকটাই সফল হয়েছে, কারণ আমরা দেশজ হাতছানিকে ঠেলে ফেলে বিদেশের অশুভ শক্তির হাতছানিতে মত্ত হয়ে উঠেছি এবং তাকেই সত্য বলে ভাবছি। অথচ নিজের দেশের, নিজের মাটির আহ্বানে আজও সাড়া দিয়ে উঠতে পারিনি। আজও আমরা ভয় পেয়ে চলেছি। মুখ গুঁজে একা একা নিজ নিজ অবস্থাতেই আছি। অথচ সহজ সরল একটা পদ্ধতি যা মানলে আর আমাদের ভয় থাকে না, আর আমরা বিচ্ছিন্ন থাকি না, তা আমরা কিছুতেই লক্ষ্য করছি না। আমাদের চোখের সামনে প্রকৃতিই তো সঙ্ঘবদ্ধতার এক বিরাট উদাহরণ। জল, বায়ু, তাপ, অরণ্য, পর্বত সবই তো সঙ্ঘবদ্ধতার এক মহানরূপ। যা আদি তাই সনাতন, যা সনাতন তাই সত্য, যা সত্য তাই চিরকাল প্রতিষ্ঠিত, অক্ষয়, অবিনশ্বর। যেমন এই বিশ্বপ্রকৃতির মহাপ্রলয় ব্যতীত লয়, ক্ষয় বা নাশ হয় না। কারণ সে সম্পূর্ণ আদি সনাতন সঙ্ঘবদ্ধতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সমাজে পৈশাচিক শক্তি বিনাশের জন্য বিভিন্ন দিকের ভেদাভেদ তুচ্ছ করে সম্মিলিত হওয়ার শিক্ষা দেয় সঙ্ঘশক্তি। আমাদের বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনার মধ্যেও আছে সঙ্ঘশক্তির আহ্বান। ত্রিদেব, অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরের একত্রিতরূপ, সরস্বতী, লক্ষ্মী, গণেশ, কার্তিক ইত্যাদি মূর্তি চোখের সামনে রাখা মানে সমাজের চতুরাশ্রমের মূর্ত্ত বিগ্রহ মাধ্যমে মানুষের মনকে জাগ্রত করা। কিন্তু আমরা কখনই সূক্ষ্মদৃষ্টি দিয়ে দেখি না, ভাবি না। তা করতে পারলে সমস্ত ভেদাভেদজ্ঞান সম্পূর্ণভাবে বিলুপ্ত হয়ে যাবে মন থেকে। ধুমধাম করে কোটি কোটি টাকার খেলা চলে শারদোৎসবকে কেন্দ্র করে। কিন্তু আমরা কেউই তার অন্তর্নিহিত অর্থের ভিতরে প্রবেশ করি না। শারোদৎসবের দুর্গাদেবী সাক্ষাৎ সঙ্ঘশক্তি স্বরূপিণী। কাঠামোতে যে সমস্ত পশুপাখি উপস্থিত থাকে, অর্থাৎ সেই পেঁচা, হংস, সিংহ, ইঁদুর, সাপ, ময়ূর সকলে আলাদা বা বিচ্ছিন্নভাবে থাকলে একে অপরের শত্রু, কিন্তু (ওই কাঠামোয়) সঙ্ঘশক্তির প্রভাবে (যা ওই কাঠামোয় দেখানো হয়েছে) তারা সকলেই মৈত্রীভাব অবলম্বন করে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ে নামার এক প্রতীকিরূপ আমাদের সামনে বিরুদ্ধে জোটবদ্ধ ভাবে লড়াইয়ে নামার এক প্রতিকিরূপ আমাদের সামনে উপস্থাপন করছে। কিন্তু আমরা তো জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করে থাকি, তা কোনো ভাবেই খুলি না। সমগ্র কাঠামো থেকে মা দশভূজা সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে সঙ্ঘবদ্ধভাবে পাপাচারিতা, অন্যায়, অধর্ম, অসত্য, হিংসা-দ্বেষ, অহংকারের বিরুদ্ধে প্রবল আঘাত হানার আদেশ দিচ্ছেন সমস্ত মনুষ্যজাতিকে।

শাশ্বত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা এবং তার স্থায়ীত্বকালেই বৈদিক এবং প্রক্‌বৈদিক কাল থেকে ঋষিগণ আমাদের চিরকাল সঙ্ঘবদ্ধতার আহ্বান দিয়ে এসেছেন। দশভূজা দেবীর যে শাস্ত্রীয় পূজাপদ্ধতি তাও এমন বৈচিত্র্যপূর্ণ যে তেমনটি আর কোথাও নেই। দেবীপূজা শুরু হয় বিল্ববরণ ও নবপত্রিকা অধিবাস ও স্নানের মাধ্যমে। এই যে বৃক্ষাদির সম্মিলিত পূজাউপাচার তার মধ্যে যে বক্তব্য লুকিয়ে আছে তা হলো— উপজাতি সম্প্রদায় এবং আদিবাসী, বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃক্ষাদি পূজার প্রচলন সব থেকে বেশি, এক্ষেত্রে তাদের প্রথম স্থানে অর্থাৎ পূজার সূচনায় রাখা হয়েছে। তাদেরকেই আগে মা দশভূজা কোলে তুলে নিয়েছেন। দেবীর মহাস্নানের আবশ্যিক বস্তুর মধ্যে আছে— গণিকাদ্বার-মৃত্তিকা, রাজদ্বার মৃত্তিকা, বরাহদন্ত-মৃত্তিকা ইত্যাদি। এখানেও মা সকলকে সমান মর্যাদাজ্ঞাপন করেছেন। তাঁর কাছে গণিকা, রাজা, পশু সকলেই সমান, সকলেই তাঁর কাছে সমসন্তান মর্যাদার। মানুষের সমাজের কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানসিকতার প্রতি মা এখানে দৃঢ়ভাবে শাসন করছেন আমাদের। কিন্তু আমরা তো জ্ঞানচক্ষু বন্ধ করেই থাকি, তা কোনো ভাবেই খুলি না।

বিগত যুগের ঋষিদের মতো রাষ্ট্ররক্ষার্থে মানবজাতির শ্রেষ্ঠদান অর্থাৎ নিজ নিজ আত্মার স্বরূপতা দানে এগিয়ে আসতেই হবে। হৃদয়কে উদার করে, চৈতন্যের সমস্ত অভাবকে দূর করে, পিপাসামুক্ত সহজ শূন্যের সরোবরের মতোই মনকে গড়ে তুলতে পারলে সে তখন হংসের মতো মুক্তান্বেষী ডুবুরি হয়ে যাবে। ব্রহ্মবস্তু অর্থাৎ শূন্যের প্রকাশিতরূপ মানব হৃদয়ে নানা আকারে প্রতিস্থাপনের প্রচেষ্টা অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষই করে আসছে, যা থেকে আজও কোনো ভাবেই বিরত থাকার উপায় নেই। বিশাল ঋণাত্মক শূন্যই বিশ্বের মূলতত্ত্ব এবং সেই তত্ত্ব ব্যাপকভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে একমাত্র সঙ্ঘবদ্ধতার আধারে। কারণ সঙ্ঘই পারে অজ্ঞানতা নাশ করে জ্ঞানচক্ষুর উন্মীলন ঘটিয়ে সঙ্ঘশক্তিময় রাষ্ট্ররূপ দর্শন করাতে। ▮

নাবালিকা বিধবার মন তাঁর মতো কেউ বোঝেননি

মণীন্দ্রনাথ সাহা

সেদিনটা ছিল ১৮২০ সালের ২৬ সেপ্টেম্বর। রামজয় বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, 'ঠাকুরদাস, আজ আমাদের একটা এঁড়ে বাছুর হয়েছে।' ঠাকুরদাস পিতার রহস্য বুঝতে পারলেন না। তিনি তাই বাড়িতে ঢুকেই গোয়ালঘরের দিকে যাচ্ছিলেন--- এঁড়ে বাছুরটিকে দেখবার জন্য।

রামজয় হেঁকে বললেন— 'ওদিকে নয়, এদিকে এসো।' এই বলে তাঁকে আঁতুড়ঘরে নিয়ে গিয়ে একটি শিশুকে দেখিয়ে বললেন— 'এই দেখ এঁড়ে বাছুর। আমি বলে রাখছি, এ ছেলে ভীষণ একগুঁয়ে হবে কিন্তু আমার বংশের মুখ রাখবে।'

সেই এঁড়ে বাছুর পরবর্তীতে দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি ছিল অসাধারণ। ছোটো ভাইয়ের বিয়ের জন্য মা তাঁকে চিঠি লিখে বলেছেন বাড়িতে যেতে। মার্শাল সাহেবের কাছ থেকে ছুটি মঞ্জুর করিয়ে নিয়েছেন। তখন ছিল বর্ষাকাল। ঘোর দুর্যোগ। বর্ষায় দামোদরের বুকে তখন প্রবল বন্যা। নদীতে একখানা নৌকাও নেই। কিন্তু সেদিন তাঁকে বীরসিংহে পৌঁছতেই হবে। সেই রাত্রেই বিয়ে। কী করেন, মহা ভাবনায় পড়লেন তিনি। মায়ের নাম স্মরণ করে বিদ্যাসাগর দুরন্ত দামোদরের বুকে ঝাঁপ দিলেন। বর্ষায় ভরা দামোদর নদ সাঁতার কেটে পার হলেন। এপারে এসে অনেকটা পথ হাঁটলেন। পথে যেতে পড়ে আর এক খরস্রোতা নদ দ্বারকেশ্বর। সেটাও তিনি সাঁতার দিয়ে পার হয়ে, রাস্তায় চোর-ডাকাতের ভয় উপেক্ষা করে মনে মনে মাকে ডাকতে ডাকতে পথ চলতে লাগলেন। রাত্রি দশটার সময় ভিজে কাপড়ে, ক্লান্ত শরীরে বাড়ি পৌঁছেই ডাকলেন— 'মা! মা, আমি এসেছি।'

একদিন সকালবেলায় এক অন্ধ মুসলমান ভিখারী তাঁর বাড়ির দরজায় এসে বেহালা বাজিয়ে গান করছে। তাঁর গানের প্রত্যেকটা লাইনে সে 'মা' কথাটা বারবার বলছে। বিদ্যাসাগরের কানে গেল সেই সুমধুর ডাক, 'মা'। অমনি নীচে নেমে এসে ভিখারীকে ভিতরে ডাকলেন। তাকে কাছে বসিয়ে গান শুনলেন তন্ময় হয়ে। শেষে টাকা দিয়ে তাকে বললেন— 'রোজ এসে আমাকে মায়ের নাম শুনিয়ে যাবি।'

কেউ যদি ভিক্ষে করতে এসে বলতো যে তার মা নেই তার কাছে ছুটে যেতেন আর

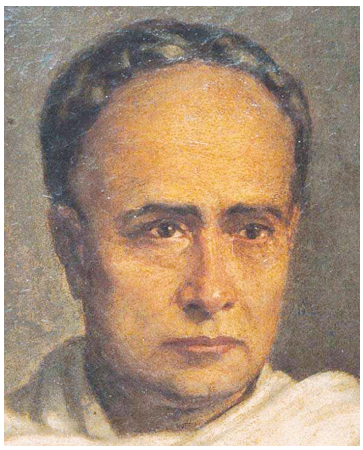

বিদ্যাসাগর চলে গেছেন ১৮৯১ সালে। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর লড়াই, তাঁর আদর্শ, তাঁর অবদান। যে আদর্শ আলো দেখিয়েছে আপামর বাঙ্গালিকে, যাঁর হাত ধরে আমাদের অক্ষর পরিচয়। তাঁর পূণ্য-চরিত্রই বাঙ্গালির কাছে চিরদিনের আদর্শ, চিরদিনের প্রেরণা।

দু'চোখের জলে তার বুক ভেসে যেত। এই 'মা' নামটির মধ্যে বিদ্যাসাগর এমনই আকর্ষণ বোধ করতেন। সেই মাতৃভক্ত সন্তান একদিন তাঁর মাকে হারালেন।

বিদ্যাসাগরের মা ও বাবা যখন কাশীতে বসবাস করছিলেন, সেই সময় কাশীর পাণ্ডারা একদিন এসে বিদ্যাসাগরকে বললেন--- 'বিশ্বেশ্বরের পুজো দেবেন না আপনি?' 'কোন বিশ্বেশ্বর?' বিদ্যাসাগরের প্রশ্ন। 'কাশীর জাগ্রত দেবতা, বিশ্বেশ্বর মহাদেব।' বিদ্যাসাগর তখন আঙুল দিয়ে তাঁর মা ও বাবাকে দেখিয়ে বললেন--- 'ওই আমার বিশ্বেশ্বর আর বিশ্বেশ্বরী, অন্য দেবতা আমি জানিও না মানিও না।'

হ্যারিসন সাহেব একজন উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী। এই হ্যারিসন সাহেব বিদ্যাসাগরকে আগে থেকেই জানতেন। তাই তিনি তাঁর মাকে দেখতে চাইলেন। সেই কথা শুনে ভগবতী দেবী তাঁকে নেমন্তন্ন করলেন। হ্যারিসন সাহেবের বয়স বেশি নয়। বাংলা বুঝতে পারেন। তিনি এসে মাটিতে মাথা রেখে ভগবতী দেবীকে প্রণাম করলেন। ভগবতী দেবীও সাহেবের মাথায় হাত রেখে ছেলের মতো আশীর্বাদ করলেন। তারপর তাঁকে কাছে বসিয়ে খাওয়াতে লাগলেন। খাওয়াদাওয়া হলে কথায় কথায় সাহেব তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন— 'আপনার কত টাকা আছে?'

ভগবতী দেবী একটু হাসলেন। তারপর বললেন--- 'কেন, আমার চারঘড়া ধন রয়েছে।' এই বলে তাঁর চার ছেলেকে দেখিয়েছিলেন। উত্তর শুনে সাহেব তো অবাক। মনে মনে ভাবলেন, ইনি যে-সে মা নন।

বিদ্যাসাগরের তখন খুব নামডাক। হুগলি জেলার এক পাড়াগাঁয়ে তিনি গিয়েছিলেন। সেখানকার লোকেরা বিদ্যাসাগর এসেছেন শুনে ছেলে-বুড়ো, পুরুষ, মেয়ে সবাই তাঁকে দেখবার জন্য ছুটে এলো। বিদ্যাসাগরের পালকি এসে থামলে রব উঠলো--- 'বিদ্যাসাগর এসেছেন। বিদ্যাসাগর এসেছেন!'

ভিড়ে মধ্যে থেকে এক বৃদ্ধা জিজ্ঞাসা করেন— 'কই গো, বিদ্যাসাগর কোথায়?' একজন বললে— 'ওই যে বিদ্যাসাগর।' বৃদ্ধা মহিলা চোখ কপালে তুলে বিদ্যাসাগরের মুখের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন। শেষে বললেন— 'ও আমার পোড়া কপাল। এই মোটা চাদর গায়ে একটা উড়ে বেহারা দেখবার

জন্য রোদে ভাজা ভাজা হলাম। না আছে গাড়ি, না আছে ঘড়ি, না আছে চোগা-চাপকান।'

একদিন সকালবেলায় এক মেথর কাঁদতে কাঁদতে এসে বললো— 'মেথরানির কলেরা হয়েছে বাবা।' অমনি বিদ্যাসাগর কলেরার ওষুধের একটা বাক্স হাতে করে মেথরের অপরিচ্ছন্ন ভগ্ন পর্ণকুটীরে এলেন। সারাদিন সেই মলমূত্রের মধ্যে বসে থেকে রোগীর চিকিৎসা ও সেবা করলেন। রোগীকে নিরাপদ মনে হলে তারপর বাড়ি ফিরলেন সন্ধ্যাবেলায়। নির্লোভ দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর চরিত্রের এই মহত্ত্বের জন্যই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি হতে পেরেছিলেন।

১২৭৩-এ বাঙ্গলার ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের দিনে আর্ত দীন দরিদ্র লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রেমাবেগে কল্লোলিত ধ্বনি— দয়ারসাগর! দয়ারসাগর! ওই দুর্ভিক্ষের ভয়ংকর সময়ে বহু মানুষকে মৃত্যুর কবল থেকে রক্ষা করেছেন ওই দয়ারসাগর। সেখানে বিদ্যা নয়, দয়ার প্লাবন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন--- 'অনেক মহৈশ্বর্যশালী রাজা রায়বাহাদুর প্রচুর ক্ষমতা লইয়া যে উপাধিটি লাভ করিতে পারে নাই, এই দরিদ্র পিতার দরিদ্র সন্তান (বিদ্যাসাগর) সেই 'দয়ারসাগর' নামে বঙ্গদেশে চিরদিনের জন্য বিখ্যাত হইয়া রহিলেন।' (বিদ্যাসাগর চরিত, রবীন্দ্রনাথ)।

বৃন্দাবন লেনে ঈশ্বরচন্দ্রের বাড়িতে হাজির পিতৃমাতৃহীনা আশ্রয়হীনা একটি মেয়ে। বড়ো বড়ো মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে ক্লান্ত হতাশ। সব বৃত্তান্ত শুনে দয়ারসাগর 'মা' বলে ডাকলেন। 'মা তোমার খাওয়া থাকা লেখাপড়া সব কিছুর দায়দায়িত্ব আজ থেকে আমার।' ভালো খাবার, ভালো কাপড় ও কিছু টাকা মেয়েটির হাতে দিলেন। দয়া দেখে মেয়েটির চোখে জল। বললেন, কোথাও এমন দয়ার হৃদয় পাইনি বাবা। লুটিয়ে পড়ল চরণে। চন্দননগরে পথের এক পাগল ছেলেকে দেখেও চোখে জল। পরের দুঃখে চোখে জল ঈশ্বরচন্দ্রের চরিত্রের বিশেষ ধর্ম।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবার মতো, শিহরিত হয়ে যাবার মতো একটি অপূর্ব ঘটনা। বৃষ্টিভরা গভীর রাত। তেমন দুর্যোগের রাতে বাড়ি ফিরছেন বিদ্যাসাগর। অকস্মাৎ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। রোমাঞ্চকর দৃশ্য। এক বারাঙ্গনা তুমুল বৃষ্টিতে ভিজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে। যদি কোনো খদ্দের জোটে কপালে। এই কুলত্যাগিনী নারীর অন্নসংস্থানের এবং জীবিকার আর কোনো উপায় নেই।--- 'বিদ্যাসাগরের করুণচিত্ত দুর্বল হইয়া গেল তিনি বারাঙ্গনার হাতে আট আনা পয়সা দিয়া বলিলেন, যাও মা, আর জলে ভিজো না।' (শ্রীনিবাস সেন মজুমদার; বিদ্যাসাগর বর্ষস্মৃতি)। এইখানেই বিদ্যাসাগর দয়ার সাগর করুণা সাগর হয়ে গেলেন। কী গভীর মূল্যবোধ। এ জাতীয় উদাহরণে ও ঘটনায় তাঁর জীবন বিস্ময়কর। প্রতিপদে করুণার বিচ্ছুরণ। কত অনাথ বিধবার সংসার যে তাঁর টাকায় চলেছে, তার ইয়াত্তা নেই। ১৮৯১-এর ৩ আগস্টের India Nation-এ লেখা হয়, 'Helpless widows and orphans, needy students of special merits were regularly maintained by him.' 'বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ দাতা বিদ্যাসাগর' বলে সংবাদ ছিল ১৯২৪-এর ১৯ এপ্রিল আনন্দবাজারে।

হঠাৎ একদিন রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব এলেন বিদ্যাসাগরের বাড়িতে। প্রথম সাক্ষাতেই রামকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'এতদিন খাল, বিল, হ্রদ, নদী এই সবই দেখেছি। এইবার সাগর দেখলুম! কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়েই যাবো।'

বিদ্যাসাগর হেসে জবাব দিয়েছিলেন— 'তবে নোনাজল খানিকটা নিয়ে যান। তা না হলে, এ সাগরে তো কেবল শামুকই পাবেন।'

উত্তরে রামকৃষ্ণ বলেছিলেন— 'না গো, নোনাজল কেন হবে। এমন না হলে সাগর দেখতে আসব কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর, তাই তুমি ক্ষীর সমুদ্র। বিদ্যাসাগর ক্ষীর- অমৃত সাগর, সেইজন্যই বিদ্যাসাগর একটিই।'

বিধবা বিবাহ আইন চালু করার জন্য রাতের পর রাত জেগে পুঁথিপত্র পড়ছেন। কম আলোয় চোখের সমস্যা হচ্ছে। ক্লান্তিতে অনিদ্রায় শরীর ভেঙে পড়ছে, হতাশা আসছে মনে। কিন্তু পরক্ষণেই চোখে ভাসছে কতকগুলি শিশু বিধবা মেয়ের মুখ। সারাদেশের হাজার হাজার বিধবা নাবালিকার অসহনীয় জীবনের দীর্ঘশ্বাস শুনতে পাচ্ছেন তিনি। আবার শুরু হচ্ছে তাঁর অন্বেষণ। তারপর পাওয়া গেল সেই মুক্তো। পরাশর সংহিতার অমর সেই শ্লোক—

''নষ্টে-মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ

পঞ্চস্বাপৎসু নারীনাং পতিরণ্যে বিধীয়তে।''

অর্থাৎ, ''স্বামী মারা গেলে, সন্ন্যাস নিলে, নিখোঁজ হলে, সন্তান দানে অক্ষম হলে, অধার্মিক ও অত্যাচারী হলে পত্নী আবার বিবাহ করতে পারে।''

তিনি ছুটলেন সরকারের দ্বারে। প্রমাণ করলেন বিধবা বিবাহ শাস্ত্র সম্মত। আর বাধা রইল না কিছুই। ১৮৫৬ সালের ১৬ মন্তান্তরে ২৬ জুলাই পাশ হলো বিধবা বিবাহ আইন। লক্ষ লক্ষ বাল্যবিধবা পেল মুক্তির আশ্বাস। শুধু চালু করেই ক্ষান্ত থাকলেন না। নিজের পুত্রের সঙ্গে এক বিধবার বিবাহ দিয়ে দেখিয়ে দিলেন সমাজকে। এখানেই তিনি অনন্য সাধারণ। আমরা আজ ১৬৫ বছর পরেও যে সংস্কার কাটিয়ে উঠতে পারলাম না, তিনি সেই যুগে দাঁড়িয়ে করে দেখিয়েছেন তা।

কবি মধুসূদন বলেছেন— '...not only Vidyasagar, but Karunasagar also.' নিজের জীবন দিয়ে বড়ো গভীর ভাবে উপলব্ধি করেছিলেন কবি মাইকেল। দয়া কাকে বলে— প্রেম কাকে বলে, করুণা কাকে বলে! চতুর্দশপদী কবিতাতেও বললেন, 'বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।/করুণার সিন্ধু তুমি সেই জানে সর্বজনে।'

এই সর্বজনের কাছেই হৃদয়গ্রাহ্য দয়ার সাগর ঈশ্বরচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ তাঁর হৃদয়ের অকপট শ্রদ্ধার অঞ্জলি নিবেদন করে লিখেছেন— ''বিদ্যাসাগর বঙ্গদেশে তাঁহার অক্ষয় দয়ার জন্য বিখ্যাত। তাঁহার দয়ায় কাপুরুষতা ছিল না। ...দয়া নহে, বিদ্যা নহে, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের চরিত্রের প্রধান গৌরব তাঁহার অজেয় পৌরুষ, আর অক্ষয় মনুষ্যত্ব।''

সেই মনুষ্যত্বের, সেই মহৎ চরিত্রের অক্ষয়বটই বাঙ্গলার মাটিতে বপন করে গেছেন বিদ্যাসাগর। এই অক্ষয়বটই আমাদের তীর্থ। তাঁর পূণ্য-চরিত্রই বাঙ্গালির কাছে চিরদিনের আদর্শ, চিরদিনের প্রেরণা।

তিনি চলে গেছেন সেই ১৮৯১ সালে। কিন্তু রয়ে গেছে তাঁর লড়াই, তাঁর আদর্শ, তাঁর অবদান। যে আদর্শ আলো দেখিয়েছে আপামর বাঙ্গালিকে, যাঁর হাত ধরে আমাদের অক্ষর পরিচয়, সেই মহামানবকে জানাই শত শত কোটি প্রমাণ।

(লেখক বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক এবং গবেষক)

ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পুনরবলোকন

দত্তাত্রেয় হোসবলে

আজ ভারত ঔপনিবেশিক দাসত্ব থেকে মুক্তির উদযাপন করছে। এই উৎসবের ধারাবাহিক উদযাপনের মধ্যে— যখন স্বাধীন ভারতের ৭৫ বছরের যাত্রার মূল্যায়ন করা হবে— ঠিক সেই সময় এই স্বাধীনতা অর্জনের জন্য চার শতাব্দীর অধিক সময় ধরে চলতে থাকা নিরন্তর সংগ্রাম এবং আত্মত্যাগের কথা পুনঃস্মরণ করাও স্বাভাবিক ঘটনা।

ভারতে ঔপনিবেশিক দাসত্বের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রীয় আন্দোলন একটি 'স্ব'-এর চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এই স্ব-এর প্রকাশ স্বধর্ম, স্বরাজ এবং স্বদেশ রূপ ত্রয়ীর মাধ্যমে সমগ্র দেশকে মথিত করেছিল। সন্ত এবং মনীষীদের সান্নিধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনা আন্দোলনে ফল্গুধারার মতো নিরন্তর প্রবাহিত হয়েছিল।

যুগ যুগ ধরে ভারতের আত্মায় নিহিত এই 'স্ব'-এর ভাব, তার সমস্ত শক্তি দিয়ে নিজেকে প্রকাশিত করেছিল এবং বিদেশি শক্তিদের প্রতি পদক্ষেপে প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই বৈদেশিক শক্তিগুলি ভারতের অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও শৈক্ষিক ব্যবস্থাকে তছনছ করে দিয়েছে, গ্রামের স্বনির্ভরতা ধ্বংস করেছে। ভারত সর্বতো ভাবে এই সমস্ত বৈদেশিক শক্তির সর্বগ্রাসী আক্রমণের প্রতিকার করেছে।

ইউরোপীয় শক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রতিরোধ বিশ্ব ইতিহাসে একটি অনন্য উদাহরণ। একদিকে বিদেশি আক্রমণের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম অন্যদিকে সমাজকে শক্তিশালী করা এবং সমাজের বিকৃতিগুলিকে দূর করে সামাজিক পুনর্গঠনের কাজের একটি বহুমুখী প্রচেষ্টা এই সংগ্রাম।

বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যের রাজারা সর্বশক্তি দিয়ে ব্রিটিশদের প্রতিহত করছিল। অন্যদিকে নিজেদের সহজ সরল জীবনে ইংরেজদের হস্তক্ষেপ ও তাদের মূল্যবোধের উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে জায়গায় জায়গায় জনজাতীয় সমাজ রুখে দাঁড়িয়েছিল। নিজেদের মূল্যবোধ রক্ষার জন্য রুখে দাঁড়ানো এই মানুষদের ইংরেজরা নৃশংসতার সঙ্গে হত্যা করেছিল। কিন্তু তারা সংগ্রাম থেকে পিছিয়ে যাননি। তাই হার না মানা মানসিকতারই পরিচয় ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে দেশব্যাপী স্বাধীনতা সংগ্রাম— যেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ তাদের জীবন উৎসর্গ করেছিল।

ভারতীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেওয়ার অপপ্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করার জন্য কাশী (বারাণসী) হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন, গুজরাট বিদ্যাপীঠ, এম.ডি.টি. হিন্দু কলেজ তিরুনেলভেল্লী, কার্ভে শিক্ষা সংস্থান, ডেকান এডুকেশন সোসাইটি এবং গুরুকুল কাংড়ির মতো প্রতিষ্ঠান এগিয়ে আসে এবং ছাত্র ও যুবকদের মধ্যে দেশপ্রেমের জোয়ার আসতে

শুরু করে। প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ও জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো বিজ্ঞানীরা যেমন ভারতের উন্নতির জন্য তাঁদের প্রতিভা উৎসর্গ করেছিলেন তেমনই নন্দলাল বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও দাদাসাহেব ফালকের মতো শিল্পীরা এবং মাখনলাল চতুর্বেদী-সহ প্রায় সকল জাতীয় নেতা সাংবাদিকতার মাধ্যমে জনজাগরণের কাজে লিপ্ত ছিলেন। তারা তাদের প্রতিভার মাধ্যমে দেশকে জাগানোর কাজ করছিলেন। মহর্ষি দয়ানন্দ, স্বামী বিবেকানন্দ এবং মহর্ষি অরবিন্দর মতো অনেক ঋষির আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণা তাদের সকলের জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করছিল।

বাঙ্গলায় রাজনারায়ণ বসু কর্তৃক হিন্দু মেলার আয়োজন, লোকমান্য তিলক কর্তৃক গণেশোৎসব ও শিবাজী উৎসব প্রভৃতি সর্বজনীন উৎসবগুলি ভারতের সাংস্কৃতিক শিকড়কে সিঞ্চিত করছিল, জ্যোতিবা ফুলে এবং সাবিত্রীবাই ফুলের মতো সমাজসংস্কারকরা নারীশিক্ষা ও সমাজের অবহেলিত জনগোষ্ঠীকে সশক্ত করার গঠনমূলক অভিযানে লিপ্ত ছিলেন। ড. আম্বেদকর সমাজকে সংগঠিত করার এবং সামাজিক সমতা অর্জনের জন্য সংগ্রামের পথ দেখিয়েছিলেন।

ভারতীয় সমাজ জীবনের এমন কোনো ক্ষেত্র ছিল না যেটি মহাত্মা গান্ধীর দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। শ্যামজী কৃষ্ণ বর্মা, লালা হরদয়াল ও ম্যাডাম কামার মতো প্রবাসী ভারতীয়দের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশেও ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা বাড়ানোর কাজ চলছিল। লন্ডনের ইন্ডিয়া হাউস ভারতের স্বাধীনতা সংক্রান্ত গতিবিধির কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবী বীর সাভারকারের লেখা ১৮৫৭ সালের জাতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস ভারতীয় বিপ্লবীদের মধ্যে অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। স্বয়ং ভগৎ সিংহ এটি প্রকাশ করে হাজার হাজার প্রতিলিপি বিতরণ করেছিলেন।

দেশজুড়ে চারশোর বেশি গুপ্ত সংগঠনের সঙ্গে জড়িত বিপ্লবীরা নিজেদের জীবন হাতে করে ভারতমাতাকে মুক্ত করার অভিযানে নিয়োজিত ছিলেন। বাঙ্গলার বিপ্লবী সংগঠন অনুশীলন সমিতির কার্যকলাপে সক্রিয় ড. হেডগেওয়ার লোকমান্য তিলকের অনুপ্রেরণায় কংগ্রেসে যোগদান করেন এবং কংগ্রেসের সেন্ট্রাল প্রভিন্সের সচিব নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২০ সালে নাগপুরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সম্মেলনের আয়োজক সমিতির সহ-সভাপতি ছিলেন। এই অধিবেশনে, তিনি তাঁর সহকর্মীদের সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব পাশ করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু কংগ্রেস নেতৃত্ব এর জন্য প্রস্তুত ছিল না। শেষ পর্যন্ত আট বছর পর লাহোরে এই প্রস্তাব পাশ হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। তাঁর নেতৃত্বে শুধু স্বাধীন ভারতের প্রথম সরকারই গঠিত হয়নি, আজাদ হিন্দ ফৌজ উত্তর-পূর্ব ভারতের কিছু অংশ স্বাধীন করতেও সফল হয়েছিল। লাল কেল্লায় আজাদ হিন্দ ফৌজের কর্মকর্তাদের বিচার গোট দেশে জনরোষ নির্মাণ করে। একই সঙ্গে ব্রিটিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে নৌবাহিনীর বিদ্রোহ ব্রিটিশদের ভারতে ছাড়তে বাধ্য করে।

স্বাধীনতার সূর্য উঠেছিল, কিন্তু দেশভাগের গ্রহণের ছায়া তার উপর পড়েছিল। কঠিন পরিস্থিতিতেও এগিয়ে যাওয়ার সাহস জাগ্রত ছিল— এই কৃতিত্ব প্রত্যেক ভারতীয়ের, যারা শতসহস্র বছরের রাষ্ট্রীয় আকাঙ্ক্ষা পূরণে নিজেদের ঘাম রক্ত ঝরিয়েছে।

মহর্ষি অরবিন্দ বলেছিলেন— ভারতকে জেগে উঠতে হবে, নিজের জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য, মানবতার জন্য। তাঁর এই উদ্ঘোষ সত্য প্রমাণিত হয় যখন ভারতের স্বাধীনতা বিশ্বের অন্যান্য দেশের মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুপ্রেরণা হয়ে ওঠে। একের পর এক, সমস্ত উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে গেল এবং ব্রিটেনের 'কখনও অস্ত না হওয়া সূর্য' চিরতরে অস্ত গেল।

পর্তুগিজ, ওলন্দাজ, ফরাসি ও সবশেষে ব্রিটিশরা ভারতে এসেছিল। প্রত্যেকেই বাণিজ্যের পাশাপাশি ভারতীয় সংস্কৃতিকে ধ্বংস ও এ দেশের মানুষকে ধর্মান্তরিত করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালায়। ১৪৯৮ সালে প্রথম ইউরোপীয় অভিযাত্রী ভাস্কো-দা-গামা যেদিন ভারতের মাটিতে পা রাখেন সেই দিন থেকেই ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে প্রতিশোধ শুরু হয়ে গিয়েছিল। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা মার্তণ্ড বর্মার কাছে পরাজিত হয়ে ওলন্দাজরা ভারত ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। পর্তুগিজরা গোয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। আধিপত্যের সংগ্রামে ব্রিটিশরা শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয় এবং তারা তাদের চক্রান্তমূলক নীতির প্রয়োগে ভারতের অর্ধেকেরও বেশি অংশে নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছিল। ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অঞ্চল ভারতীয় শাসকদের নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং তাদের সঙ্গে ব্রিটিশরা চুক্তি করেছিল। স্বাধীনতার পর এই রাজ্যগুলি গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষের একটি সঙ্ঘ হিসেবে আবির্ভূত হয়।

ভারত গণতন্ত্রের পথ বেছে নিয়েছে। আজ বিশ্বের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে সফল গণতন্ত্র ভারত। যারা ভারতের সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ রক্ষায় স্বাধীনতা আন্দোলনে অবদান রেখেছিলেন, তারা ভারতের জন্য সংবিধান প্রণয়নের দায়িত্বও পালন করেছিলেন। এই কারণেই সংবিধানের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থে ছবির মাধ্যমে রামরাজ্যের কল্পনা করা হয়েছিল এবং ব্যাস, বুদ্ধ ও মহাবীরের মতো ভারতীয়তার ব্যাখ্যাকারীদের প্রদর্শনের মাধ্যমে ভারতের সাংস্কৃতিক প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

'স্বাধীনতার অমৃত উৎসব' উপলক্ষ্যে সেই সমস্ত হুতাত্মা দেশপ্রেমিকদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের সময় এসেছে, যাদের ত্যাগ ও আত্মোৎসর্গের ফলে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বিশ্বে আমাদের ন্যায্য স্থানপ্রাপ্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছি। সেই সব অজ্ঞাতনামা বীর, এই আলোচনার বাইরে থাকা সমস্ত ঘটনা, প্রতিষ্ঠান ও স্থান, যাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলনের পথিকৃৎ এবং মাইলফলক হিসেবে প্রমাণিত, তাদের পুনরবলোকন, মূল্যায়ন এবং তাদের সঙ্গে সম্পৃক্ত লোকস্মৃতির সংকলন করে তাদের মূলধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে যাতে আগামী প্রজন্ম জানতে পারে যে আজকের প্রজন্মের কাছে সহজলভ্য স্বাধীনতার পিছনে, বহু প্রজন্মের সাধনা, রাষ্ট্রদেবতার আরাধনার জন্য বহু শতাব্দী যাবৎ প্রবাহিত অশ্রু, ঘাম ও শোণিত প্রবাহ রয়েছে।

(লেখক বর্তমানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের সরকার্যবাহ)

বাংলা সিনেমার দুই দেবী

রূপশ্রী দত্ত

বাংলা চলচ্চিত্রে বিভিন্ন যুগের দুই নায়িকাকে অসামান্যা বলা যায়। তাঁরা দুজনেই বহুমুখী সংস্কৃতির আধার। প্রথমজন হলেন— কানন দেবী ও দ্বিতীয়জন অরুন্ধতী দেবী।

কানন দেবী জন্মগ্রহণ করেছিলেন ২২ এপ্রিল, ১৯১৬ সালে। তাঁর মৃত্যু হয়েছিল ১৭ জুলাই, ১৯৯২। তিনিই প্রথম ভারতীয় ছবির গায়িকা ও নায়িকা। এছাড়া তিনি ছিলেন প্রযোজিকা ও পরিচালিকা।

তিনি জন্মেছিলেন, পশ্চিমবঙ্গের হাওড়ায়। তাঁর আত্মজীবনীর নাম 'সবারে আমি নমি'। তাঁর পিতা ও মাতার নাম যথাক্রমে রতন চন্দ্র দাশ ও রাজবালা দেবী। হাওড়ার সেন্ট অ্যাগনেস কনভেন্ট স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন কানন। কিন্তু সেখানে শিক্ষা সম্পূর্ণ হয়নি।

বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর, তুলসী ব্যানার্জি নামে এক ব্যক্তি, যিনি কাননের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন এবং কানন যাঁকে 'কাকাবাবু' বলতেন, তিনি 'ম্যাডান থিয়েটার' নামক প্রতিষ্ঠানে কাননের যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর বাবা-মায়ের মৃত্যুর পর। তখন তাঁর বয়স দশ। তিনি তখন 'কাননবালা' নামে পরিচিতা ছিলেন। তিনি ১৯২৬-১৯৩২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 'ঋষির প্রেম', 'জোরকদম', 'বিষ্ণুমায়া', 'প্রহ্লাদ' ছবিগুলিতে অভিনয় করেছিলেন।

১৯৪৮ সালে শ্রীমতী পিক্‌চার্স' নামে এক প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান গড়েন। রবীন্দ্রসংগীত ও আধুনিক গান তিনি নেপথ্য-গায়িকা হিসেবে গেয়েছেন। পঙ্কজ মল্লিক, অনাদি দস্তিদার এছাড়া রবীন্দ্রনাথ

কানন দেবী

ও নজরুলের সঙ্গেও তাঁর পরিচয় ছিল। মুক্তি, অভিনেত্রী, অভয়া ও শ্রীকান্ত ইত্যাদি তাঁর অভিনীত ছবি। এছাড়া নেপথ্য গায়িকা হিসেবে বিখ্যাত হয়েছিলেন 'মেজদিদি', 'নববিধান' 'মানময়ী গার্লস স্কুল' 'মুক্তি' আঁধারে আলো' 'আশা' ইত্যাদি ছবিতে গান গেয়ে।

ব্রাহ্মসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের পুত্র অশোক মৈত্রের সঙ্গে ১৯৪০ সালে তাঁর বিবাহ হয়। বিবাহ বিচ্ছেদ হয় ১৯৪৫ সালে। ১৯৪৯ সালে তৎকালীন রাজ্যপালের দেহরক্ষী হরিদাস ভট্টাচার্য্যকে তিনি বিবাহ করেন। কানন দেবীর গাওয়া জনপ্রিয় গানগুলির অন্যতম হলো— 'মেজদিদি' ছবিতে তাঁর 'প্রণাম তোমায় ঘনশ্যাম' গানটি।

তাঁর সম্মান প্রাপ্তির তালিকাও দীর্ঘ। ১৯৪২ সালে 'পরিচয়' ছবির জন্য, বি.এফ.জে.এ. পুরস্কার। ১৯৪৩ সালে সেই একই পুরস্কার পেয়েছিলেন 'শেষ উত্তর' ছবির জন্য। ১৯৬৮-তে পেয়েছিলেন 'পদ্মশ্রী' এবং ১৯৭৬-এ দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার।

দ্বিতীয়জন হলেন অরুন্ধতী দেবী। ২৯ এপ্রিল, ১৯২৪-এ তাঁর জন্ম। মৃত্যু ১ জানুয়ারি ১৯৯০। নায়িকা, পরিচালিকা, লেখিকা ও গায়িকা অরুন্ধতী দেবী বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী ছিলেন। সেখানে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের তত্ত্বাবধানে রবীন্দ্রসংগীত শিল্পী হিসেবেই তিনি কর্মজীবন শুরু করেন। অভিনেত্রী হিসেবে কার্তিক চট্টোপাধ্যায় পরিচালিত ও সাহিত্যিক প্রবোধ কুমার সান্যাল লিখিত 'মহাপ্রস্থানের পথে' (১৯৫২) তাঁর প্রথম ছবি। হিন্দিতে এটি 'যাত্রিক' নামে মুক্তি পেয়েছিল। এরপর দেবকীকুমার বসু পরিচালিত 'নবজন্ম' ও অসিত সেন পরিচালিত ও সাহিত্যিক আশুতোষ মুখোপাধ্যায় লিখিত 'চলাচল' ও 'পঞ্চতপা' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। গত শতাব্দীর পাঁচ ও ছয়ের দশকে পরিচালক তপন সিংহের 'ঝিন্দের বন্দি',

অরুন্ধতী দেবী

'কালামাটি', 'জতুগৃহ' ছবিতে অভিনয় করেছিলেন। নামভূমিকায় অভিনেত্রী হিসেবে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত ছবি 'নিবেদিতা'তে বি.এফ.জে.এ. পুরস্কার পেয়েছিলেন। ছবিটির পরিচালক ছিলেন বিজয় বসু। অরুন্ধতী দেবী পরিচালিত 'ছুটি' অত্যন্ত জনপ্রিয় ছবি। এতে অবশ্য তিনি অভিনেত্রী নন।

পরিচালক প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর স্বল্পস্থায়ী বিবাহিত জীবনের পর তাঁর দ্বিতীয় স্বামী ছিলেন পরিচালক তপন সিংহ। তাঁদের পুত্র বৈজ্ঞানিক অনিন্দ্য সিংহ।

পরিচালক হিসেবে তাঁর ছবি 'পদীপিসির বর্মী বাক্স'। ছুটি ছবিতে তিনি চিত্রনাট্যকার, পরিচালিকা ও সংগীত পরিচালক ছিলেন।

তথ্যসূত্র : আশিস রাজাধ্যক্ষ, গণেশ, অনন্তরামন-এর কিছু রচনা।

অলিম্পিকের ইতিহাস

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমরা সকলেই 'অলিম্পিক গেমস' সম্বন্ধে জানো। ২০২১ সালে জাপানের টোকিয়োতে গ্রীষ্মকালীন অলিম্পিক, ২০২০ আয়োজিত হলো। ভারতের ঝুলিতে এবার সোনা নিয়ে এসেছেন সুবেদার নীরজ চোপড়া, ভিএসএম। বর্শা নিক্ষেপকারী ভারতীয় খেলোয়াড়। তোমরা নিশ্চয়ই এও জানো, এবারের অলিম্পিকে ভারত মোট ৭টি পদক পেয়েছে। কিন্তু বন্ধুরা আজ আমি তোমাদের অলিম্পিক গেমসের ইতিহাস নিয়ে কিছু বলব। কবে থেকে শুরু হলো এই অলিম্পিক বা প্রথম কোথায় শুরু হয়েছিল এটি, সেই ইতিহাসকে নিয়ে আসব তোমাদের সামনে।

ঐতিহাসিক তথ্যসমূহের ভিত্তিতে মনে করা হয় ৭৭৬ খ্রিস্টপূর্বতে গ্রিসের অলিম্পিয়ায় এই খেলার সূচনা হয়। এরপর এই খেলা প্রতি চার বছর অন্তর হাজার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলার পর ৩৯৪ খ্রিস্টাব্দে ষষ্ঠ রোমান সম্রাট প্রথম থিওডোসিয়াস রাষ্ট্রীয় ধর্ম হিসেবে খ্রিস্টীয় মতবাদ প্রবর্তন করতে চেয়ে এই খেলা বন্ধ করে দেন। মানব সভ্যতার শুরুতে প্রাচীন গ্রিস বিভক্ত ছিল অনেকগুলি নগররাষ্ট্রে। এগুলি হলো স্পার্টান, এথেন্স, ডেলফি, করিন্দু, থিবিস, আরগোস প্রভৃতি। সে সময় নগররাষ্ট্রগুলো একে অপরের সঙ্গে প্রায়ই যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। অলিম্পিক চলাকালীন অলিম্পিক যুদ্ধ বিরতি ঘোষণা করা হতো যাতে প্রতিযোগীরা নির্ভয়ে স্ব-স্ব দেশ থেকে এসে অলিম্পিকে অংশ নিতে পারে। বিজয়ীর মাথায় পরিয়ে দেওয়া হতো লরেল পাতার মুকুট। ক্রমে অলিম্পিক নগর-রাজ্যগুলি পরস্পরের উপরের ক্ষমতা জাহির করার হাতিয়ার হয়ে ওঠে।

এই খেলার মাধ্যমে গ্রিক সংস্কৃতিও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক প্রসার পায়। অলিম্পিক শুধুমাত্র খেলার উৎসব ছিল না। এখানে একাধারে ধর্মীয় ও শিল্পকলার উৎসবও হতো। ৪৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অলিম্পিয়ায় নির্মিত হয় সিংহাসনে বসা হাতির দাঁত এবং সোনার তৈরি দেবরাজ জিউসের মূর্তি, যা ছিল প্রাচীন বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম। আজ আর সে মূর্তি নেই।

প্রাচীন অলিম্পিক আজকের অলিম্পিকের থেকে একেবারেই আলাদা ছিল। অনেক কম বিভাগ ছিল এবং শুধুমাত্র গ্রিস দেশের পুরুষরাই এতে অংশগ্রহণ করতে পারতেন। যদিও বিলিস্টিচ নামে এক মহিলার নাম বিজয়ী হিসেবে পাওয়া যায়। এই খেলা আজকের মতো এক এক বছর এক এক স্থানে না হয়ে প্রতি চার বছর অন্তর অলিম্পিয়াতেই অনুষ্ঠিত হতো। তবে একটি ব্যাপারে প্রাচীন ও আধুনিক অলিম্পিক গেমসের মধ্যে মিল আছে, বিজয়ী প্রতিযোগীরা আজও একইভাবে সম্মানিত, প্রশংসিত ও সম্বর্ধিত হন। তাদের কীর্তি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয় যাতে আগামী প্রজন্ম অর্থাৎ তোমরা বন্ধুরা উদ্বুদ্ধ ও অনুপ্রাণিত হতে পারে। □

ব্যক্তিত্ব

নলিনী বালা দেবী

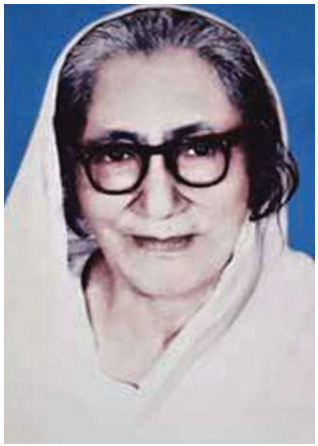

নলিনীবালা দেবী অসমের একজন কবি ও লেখিকা। তিনি অসম সাহিত্য সভার প্রথম সভাপতি ছিলেন। তিনি আনুষ্ঠানিক শিক্ষা গ্রহণ না করেই অসাধারণ পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন। অসমীয়া কাব্য সাহিত্যে রহস্যবাদী কবি নামেও তিনি পরিচিত। তিনি তাঁর পিতার সঙ্গে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। নলিনীবালা দেবী সাহিত্য অ্যাকাডেমি পুরস্কার ও ভারত সরকারের পদ্মশ্রী পুরস্কার পেয়েছেন।

জানো কি?

- বিশ্বের বৃহত্তম মরুভূমি---সাহারা মরুভূমি
- কেন্দ্রীয় ধান গবেষণাগারটি কোথায় অবস্থিত—কটক
- মাউন্ট এভারেস্ট কোন দেশে অবস্থিত—নেপাল
- কৃষ্ণ মৃত্তিকা কোন চাষের জন্য সবচেয়ে উপযোগী—তুলা
- কোন শহরটি 'ভারতের প্রবেশদ্বার' নামে পরিচিত—মুম্বাই
- কোন দেশকে 'উদীয়মান সূর্যের দেশ' বলা হয়—জাপান
- ভারতের গোলাপি শহর বলা হয়—জয়পুর

ভালো কথা

দুঃখের দিনেও আনন্দ

কয়েকদিন আগে আমি আমার বাবার পিসেমশাইয়ের শ্রাদ্ধের অনুষ্ঠনে গিয়েছিলাম। সেখানে আমরা অনেক ভাই-বোন একত্রিত হয়েছিলাম। সারাদিন আমরা আনন্দে মেতে থাকতাম। মা-বাবা বলত শোকের অনুষ্ঠানে ওরকম চিৎকার চেঁচামেচি করতে নেই। কিন্তু আমি বুঝতেই পারছিলাম না। অনুষ্ঠানের দিন অতিথি অভ্যাগতদের হাতে একটি করে মাস্ক দিয়ে সারা শরীরে স্যানিটাইজার স্প্রে করে দিচ্ছিলাম। আর সবাইকে নমস্কার করছিলাম। বিকেলে অনুষ্ঠান শেষ হতেই আবার আমরা আনন্দে মেতে উঠতাম। কখনও আবৃত্তি, কখনও গান, কখনও রাজন্যাদিদির ক্ল্যাসিক নাচ। বাড়ি যাওয়ার দিন আমাদের সবার মন খারাপ হয়ে গিয়েছিল। দুঃখ-দুঃখ মন নিয়েই বাবা-মার সঙ্গে বাড়ি ফিরে এলাম।

ওঙ্কার মণ্ডল, তৃতীয় শ্রেণী, তপন, দিনাজপুর।

তোমার দেখা বা তোমার সঙ্গে ঘটা এরকম ভালো কোনো ঘটনা যদি থেকে থাকে তাহলে চটপট লিখে পাঠাও আমাদের ঠিকানায়।

কবিতা

প্রকৃতি

অনামিকা পাল, সপ্তম শ্রেণী, সেইন্ট কেপিটেনিও স্কুল, শিলচর।

কালো মেঘ একজোট,
ছেয়ে গেলো আকাশে।
ধুলোবালি সবকিছু
মিশে গেল বাতাসে।
হঠাৎ অনেক জোরে
হলো এক শব্দ,
সবাকার প্রাণবায়ু
হলো যেন স্তব্ধ।
সাথে সাথে ঘড় ঘড়
করে এলো বৃষ্টি।
কী মধুর প্রকৃতির
এই গূঢ় সৃষ্টি।

কবিতা পাঠাতে হবে এই ঠিকানায়

নবাঙ্কুর বিভাগ
স্বস্তিকা
২৭/১বি, বিধান সরণি
কলকাতা - ৭০০ ০০৬
হোয়াটস্ অ্যাপ - 8420240584

E-mail : swastika5915@gmail.com

ফোন, এস এম এস বা মেল করা যেতে পারে।

(পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরাই উত্তর পাঠাতে পারবে)

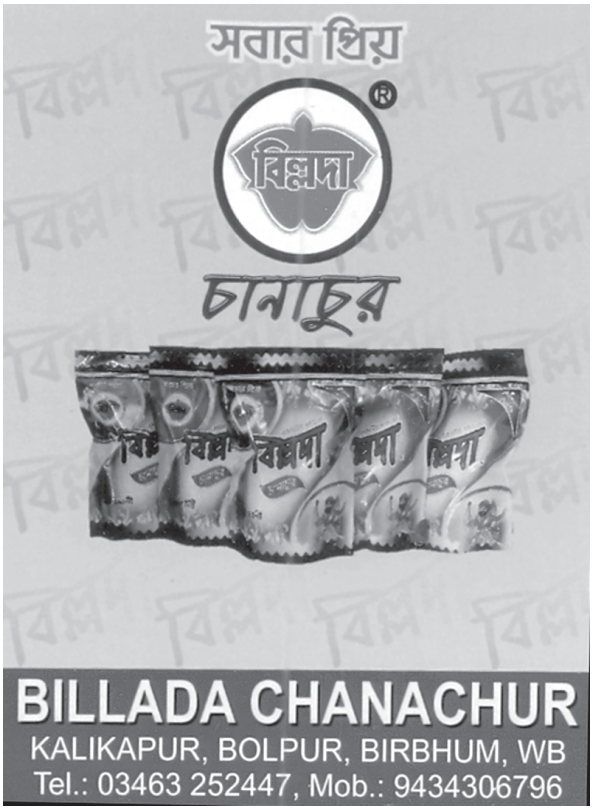

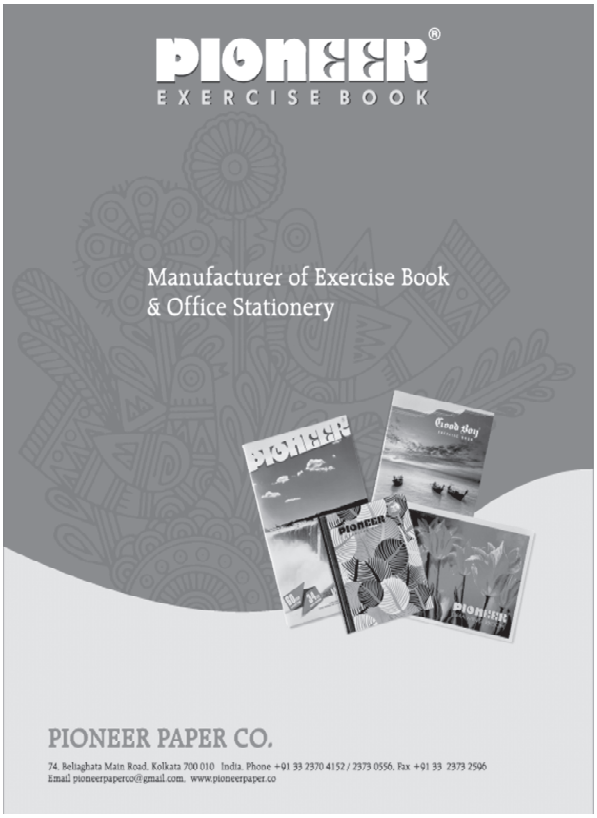

যোগ চিকিৎসা

যে কোনো শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৪০০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার যৌগিক কলেজ

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯
ফোন : ৯৮৩০৫৯৭৮৮৪
৯০৫১৭২১৪২০

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী

নিউ কমল ব্রাণ্ডের
ভাজা সামুই ব্যবহার করুন।
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।

শান্তিনিকেতন, বোলপুর,
মোবাইল - ৯২৩২৪০৯০৮৫

সাতজন কোনিকে দেখলে আপনি কী বলতেন ক্ষিতদা

সন্দীপ চক্রবর্তী

নীরজ চোপড়ার জ্যাভলিন যখন টোকিয়োর মাটিতে আছড়ে পড়ছিল তখন হাওড়ার পঞ্চাননতলার একটি ছোট্ট ফ্ল্যাটে বসে শ্রীযুক্ত মহাদেব পাল মৃদুমন্দ হাসছিলেন। তিনি ঘনাদার উত্তরসূরি। হ্যারিকেন থেকে আমফান— যে ঝড়ই ধেয়ে অসুক মোটেই বিচলিত হন না। বিকেলের বরান্দ চায়ের কাপে সশব্দে চুমুক দিয়ে মাথাটি অল্প নেড়ে দিব্যি বলে দেন, 'এ আর এমন কী! আমাদের সময়ে এর থেকেও মারাত্মক ঝড় উঠত। নারকেল গাছগুলো পায়ের কাছে এসে লুটোপুটি খেত। তোরা তো এই সেদিনের ছেলে, তাই এসব ফক্কিকারি দেখে ভয় খাচ্ছিস।' কিন্তু নীরজের সোনা পাওয়ার দিনে মহাদেবদা ওর বিজ্ঞ মাথাটি নাড়েননি। এমনকী, ওর 'এ তো আমি আগেই জানতুম'--- গোছের হাসিটাও হাসেননি। সেদিন সন্ধ্যেবেলায় আমার সঙ্গে দেখা হওয়া মাত্র বললেন, 'এই যে তোকেই খুঁজছিলুম। ক্ষিতদাকে তোর মনে আছে?'

আমি একটু অবাক। বেমক্কা এমন একটা প্রশ্ন আশা করিনি। বললাম, 'ক্ষিতদা! মানে, মতি নন্দীর উপন্যাস কোনির ক্ষিতদা?'

'হ্যাঁ রে। সেই ক্ষিতদা। তিনি যদি রিয়েল হতেন তাহলে আজ নীরজ চোপড়ার সাকসেস দেখার পর ওর মতো আনন্দ কারো হতো না।'

সেদিন মহাদেবদা আরও অনেক কথা বলেছিলেন। নীরজের সাফল্য ওকে আবেগপ্রবণ করে তুলেছিল। শুধু নীরজের সাফল্যই বা কেন! অলিম্পিক শেষ হয়ে যাবার পরেও ওর সঙ্গে দেখা হয়েছে। পিভি সিন্ধু, মীরাবাঈ চানু, লভলীনা বড়োগোঞাই, রবিকুমার দাহিয়া, বজরং পুনিয়া— প্রত্যেকের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন মহাদেবদা। ভারত একটা করে পদক জিতেছে আর বিশুর চায়ের দোকানের বেঞ্চে বসে মহাদেবদা দরাজ গলায় বলেছেন, 'ওরা যা খেতে চায় খাইয়ে দে বিশু। আজ সব খরচ আমার।'

কিন্তু পাঠক, এই নিবন্ধ মহাদেবদাকে নিয়ে নয়। এই নিবন্ধ ভারতের সাতজন কোনিকে নিয়ে। আর হ্যাঁ, ক্ষিতদাকে নিয়েও। সেই ক্ষিতদা, যিনি তাঁর কন্যাসম সাঁতারু শিষ্যা কোনিকে সাঁতার শিখিয়েছিলেন। প্রতিযোগিতায় নামার আগে কোনি যখন টেনশনে দিশেহারা তখন তাকে সাহস দিয়েছিলেন। আমার মতো যাদের ছোটোবেলা আশি কিংবা নব্বইয়ের দশকে কেটেছে তারা বোধহয় আজও ভুলিনি ক্ষিতদার সেই কথাগুলো, 'ফাইট! কোনি ফাইট!' সামান্য কয়েকটি কথা। কিন্তু এই সামান্য কথাগুলোই অপরিমেয় শক্তি জুগিয়েছিল কোনিকে। আর সে তোলপাড় করে দিয়েছিল সুইমিং পুলের জল। সেদিন জিতেছিল কোনি। আজকের নীরজের মতো। সিন্ধুর মতো।

ভারতবর্ষ প্রতিভার দেশ। সাহিত্য, সংগীত, শিল্পকলা, খেলাধুলো— কোনও ক্ষেত্রেই এ দেশে প্রতিভার শেষ নেই। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমাদের অলিম্পিকের অভিজ্ঞতা খুব সুখকর নয়। চার বছর অন্তর প্রতিটি অলিম্পিকে অসংখ্য ক্রীড়াবিদ অলিম্পিকে যান আর ব্যর্থমনোরথ হয়ে ফিরে আসেন। স্বপ্ন দেখিয়ে যাওয়া এবং শূন্য হাতে ফিরে আসাকেই আমরা ভারতবাসীরা একটি স্থির

সত্য বলে মেনে নিয়েছিলাম। ঠিক যেমনটি পাকিস্তানের ক্রীড়াপ্রশাসক ইয়াহিয়া খান একবার বলেছিলেন, ভারতের অনেকেই তাঁর অনুকরণে বিশ্বাস করতে শুরু করেছিলেন যে ভারত সাফ গেমসে দৈত্য, এশিয়াডে সাধারণ মানুষ আর অলিম্পিকে শিশু। ২০১২ সালে অভিনব বিন্দ্রা ব্যক্তিগত রাইফেল শুটিংয়ে সোনা পাওয়ার পর ছবিটা সামান্য পাল্টেছিল বটে,কিন্তু জংধরা লোহার চাকায় তেল দিলে ক্যাঁচ ক্যাঁচ আওয়াজটাই যা বন্ধ হয়— ধুলো উড়িয়ে দৌড়তে পারে না সে চাকা। তার প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল পরের অলিম্পিকে, ২০১৬ সালে। ভারতকে বিশ্বের ক্রীড়া মানচিত্রে একটি গর্ব করার মতো স্থান দেবার জন্য প্রয়োজন ছিল পর্যাপ্ত সরকারি নজরদারির। প্রয়োজন ছিল ক্রীড়াক্ষেত্রে বিনিয়োগের। হ্যাঁ পাঠক, বিনিয়োগ। ব্যয়বরাদ্দ নয়। কিন্তু স্বাধীনতার পর কোনও ভারত সরকারই এই নিয়ে বিশেষ চিন্তাভাবনা করেনি। সম্ভবত তাদের কাছে খেলা ছিল ছেলেখেলার বিষয়। এই পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষিতদার বলা কথাগুলো আরও প্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়। তিনি বলেছিলেন, 'ফাইট! কোনি ফাইট!' কিন্তু এই কথা কি তিনি শুধুই কোনিকে বলেছিলেন? ভারতকে বলেননি? ভারতের সরকারকে বলেননি? মতি নন্দীর লেখায় কোনি কোথায় যেন নিমিত্তমাত্র হয়ে যায়। মনে হয় যেন ক্ষিতদা বলছেন, 'ফাইট! ইন্ডিয়া ফাইট!' কিন্তু আমরা শুনেছি, 'ফাইট! কোনি ফাইট।'

ফাইট! লড়াই! শব্দটা এখনও মানুষের অভিযানে টিকে আছে। প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবনের নেশায় বুঁদ হয়ে থাকা এই পৃথিবীতে হয়তো খুব বেশিদিন টিকে থাকতে পারবে না। একটা ক্লিকেই রাতারাতি সবাই পেয়ে যাবে স্বপ্নপূরণের চাবিকাঠি। কিন্তু ভারতের অলিম্পিক দলের সদস্যদের প্রত্যেকের মুখগুলো লক্ষ্য করুন পাঠক। ওদের সবাই জেতেননি। কিন্তু হেরে গেলেও শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত লড়াই করেছেন। সেই লড়াইয়ের আঁচ রয়েছে ওদের শরীরী ভাষায়। ইংরিজিতে যাকে অ্যাটিটিউড বলে, সেই অ্যাটিটিউডের ঝাঁজ রয়েছে ওদের প্রতিটি পা ফেলায়। ওদের দেখলে হীনমন্যতায় কুঁকড়ে যাওয়া ভারতীয় ক্রীড়াপ্রেমীর মন আশ্বস্ত হয়। মফস্বল শহরের অখ্যাত পাড়ার বাসিন্দা সাতসকালে টিভির সামনে বসে চোয়াল শক্ত করে বলতে পারে, ওরা পারবে। আমরা পারব। ১৩৫ কোটি মানুষের এই আত্মবিশ্বাসে ভর করেই ঈগলের মতো উড়ে যায় নীরজের জ্যাভলিন। মীরাবাই চানু অবলীলায় গন্ধমাদন পাহাড় মাথার ওপর তুলে খোঁজ দেন বিশল্যকরণীর। সিন্ধুর র‍্যাকেটের ঘা খেয়ে শাটল ককের ডানা গজায়। ভারতীয় হকিস্টিকের জাদুতে বল জড়িয়ে যায় জালে। টিভির সামনে ঘুমচোখে বসে থাকা পনেরো বছরের কিশোর চিৎকার করে ওঠে, 'গোওওওল!'

ছবিগুলো টুকরো টুকরো। কিন্তু জুড়তে পারলে একটা মানচিত্রের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠবে। মানচিত্রটি ভারতের। এই ক'দিন বোধহয় অলিম্পিকের টানেই এক হয়ে গিয়েছিল দেশটা। ব্যক্তি নয়, দল নয়, সবাই চাইছিলেন দেশ জিতুক। শরিকি ঝগড়ায় হাঁড়ি-হেঁশেল আলাদা পরিবারেও ঢুকে পড়েছিল দেশ। ভোরবেলায় ঘুম থেকে উঠে বড়ো মেজ এবং ছোটো— তিন যুযুধান কর্তা একসঙ্গে বসে টিভি দেখেছেন। পোডিয়ামের এক নম্বর ধাপে দাঁড়িয়ে নীরজের পদক নেবার সময় হাততালি দিয়েছেন বাচ্চাদের মতো। জাতীয় সংগীত বাজার সময় ডায়াবিটিক বড়ো কর্তা উঠে দাঁড়াতে দেরি করছেন দেখে মেজকর্তা তাড়া দিয়েছেন, 'কী হলো বড়দা! তাড়াতাড়ি ওঠো। জাতীয় সংগীত বাজছে শুনতে পাচ্ছ না? বসে বসে শুনবে নাকি!' জাতীয় সংগীত বাজার সময় উঠে দাঁড়াতে হবে। বসে বসে শুনলে তার অপমান হয়। বাঙ্গালি মেজবাবু সেটা ভোলেননি। আর অন্যদিকে ঘরের এক কোণে দাঁড়িয়ে মীরাবাই চানুর শুকনো মুখ দেখে কষ্ট পেয়েছেন বাষট্টি বছরের মেজ বউঠান। মনে মনে বলেছেন, 'আহা মেয়েটার খাওয়া হয়েছে তো? ওদের খাওয়াদাওয়ার দেখাশোনা ঠিকমতো হচ্ছে তো?' তিনি জানতেনই না ওজন কমানোর জন্য মীরাবাইকে অনেকদিন প্রায় উপোশ করে থাকতে হয়েছে। কিন্তু মেজ বউঠান না জানলে কী হয়, মেয়ের শুকনো মুখ মাকে সব কথা বলে দিয়েছিল।

এই নিবন্ধ শুরু হয়েছিল ক্ষিতদার কথা দিয়ে। শেষেও আবার ক্ষিতদা। তবে গল্পের নয়, রিয়েল ক্ষিতদা। তিনি দেশের প্রাধানমন্ত্রী। নরেন্দ্র দামোদরদাস মোদী। যেভাবে তিনি জয়ী এবং পরাজিত খেলোয়াড়দের পাশে দাঁড়িয়েছেন, তাদের কাঁধে হাত রেখে উৎসাহ এবং সান্ত্বনা দিয়েছেন তাতে তাকে ক্ষিতদা ছাড়া আর কিছু মনে হয় না। কেন্দ্রীয় সরকারের খেলো ইন্ডিয়া প্রকল্প ভারতীয় ক্রীড়াজগতকে অক্সিজেন জুগিয়েছে। ২০১২ সালে অভিনব বিন্দ্রার স্বর্ণপদক জয়ের কৃতিত্বকে খাটো না করেও বলা যেতে পারে রাইফেল শুটিং আর অ্যাথলেটিক্স একই পর্যায়ের খেলা নয়। শুটিংয়ের প্রতি আজও ধনী পরিবারের সন্তানেরাই আকৃষ্ট হন। ট্রেনিং, স্পনসর জোগাড় করা এবং বিশ্বমানের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার ব্যাপারে সরকারের ওপর তাদের খুব বেশি নির্ভর করতে হয় না। কিন্তু অ্যাথলেটিক্স সেই তুলনায় সাধারণ মানুষের খেলা। দরিদ্র পরিবার থেকেই সাধারণত উঠে আসেন অ্যাথলেটরা। মিলখা সিংহ থেকে শুরু করে পিটি উষা কেউই এর ব্যতিক্রম নন। সরকারের ওপর এদের নির্ভরশীলতা শুটারদের তুলনায় অনেক বেশি। সুতরাং অ্যাথলেটিক্সে সোনা জয় ভারতের ভবিষ্যতের অলিম্পিয়ানদের জন্য একটা অম্লান মাইলফলক তো বটেই। যদিও নরেন্দ্র মোদীর আগে আর কোনও প্রধানমন্ত্রী এমন একটি মাইলফলক নির্মাণের কথা ভাবেননি। যদি ভাবতেন তাহলে ভারতের ক্রীড়া ইতিহাস অন্যরকম হতো। জীবনের সব ক্ষেত্রেই মাতৃসম ভারতবর্ষ আর সন্তানসম ভারতবাসীকে উজ্জ্বল করে তুলতে চান বলেই তিনি ক্ষিতদা। রিয়েল ক্ষিতদা। কিন্তু গল্পের ক্ষিতদা সাতজন কোনিকে একসঙ্গে দেখলে কী বলতেন? জানি না কী বলতেন। কোনি উপন্যাসের লেখক মতি নন্দী থাকলে হয়তো বলতে পারতেন। কিন্তু নাই বা জানলাম, ক্ষিতদা কী বলতেন কল্পনা করতে দোষ কী! ক্ষিতদা নিশ্চয়ই আগে পরাজিতদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতেন। বলতেন, 'ডোন্ট গিভ আপ। একটা কথা মনে রাখবে সবাই, উইনারস নেভার কুইট। আর, কুইটারস নেভার উইন।' হাল ছেড়ো না বন্ধু। হাল যে ছেড়ে দেয় সে কখনও জেতে না আর যে জেতে সে কখনও হাল ছাড়ে না।

আর জয়ীদের বলতেন, 'একটা মেডেলে আটকে থেকো না ভাই। পরের লড়াই আরও কঠিন। চলো আবার নতুন করে শুরু করা যাক।'

নীলরতন সরকারের নাম শুনলে অর্ধেক রোগ সেরে যেত

ডঃ বিপুল সরকার

ডাঃ নীলরতন সরকার যে কেবলমাত্র চল্লিশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভারতীয় চিকিৎসকদের মধ্যে উৎকর্ষ এবং খ্যাতির শিখরে ছিলেন তাই নয় তিনি ছিলেন আদ্যোপান্ত একজন ভারতীয় চিকিৎসক, শিক্ষাবিদ, সমাজসেবী এবং স্বদেশি উদ্যোক্তা তথা ভারতীয় চিকিৎসা জগতের এক দীপ্তিময় বাঙালি ঋষি। তিনি ভারতবর্ষের মানুষের সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক, অর্থনৈতিক ও শিল্প প্রজন্মকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য অখণ্ড বাংলায় তথা ভারতভূমিতে এক বলিষ্ঠ অবদান রেখে গেছেন। তিনি ছিলেন একজন দেশপ্রেমিক এবং তাঁর হৃদয়ের মূল মন্ত্র ছিল জাতীয়তাবাদ।

সাল ১৯৪১। জীবনের শেষ দিনগুলোয় অসুখে ভুগছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শেষ বয়সে তিনি প্রস্টেট গ্রন্থির সমস্যায় কষ্ট পাচ্ছিলেন। প্রায় প্রতিনিয়ত খারাপ হচ্ছিল শরীর। ডাক্তাররা বার বার অস্ত্রপচারের কথা বলছিলেন। বিধানচন্দ্র, চিকিৎসক ইন্দুভূষণ বসু, ললিতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু কবির তাতে মত নেই। তার ইচ্ছে, 'মানুষকে তো মরতেই হবে একদিন। একভাবে না একভাবে এই শরীরের শেষ হতে হবে তো, তা এমনি করেই হোক না শেষ। মিথ্যে এটাকে কাটাকুটি ছেঁড়াছেঁড়ি করার কি প্রয়োজন?' সেই সময় কবির শরীরের যা অবস্থা তখন তাঁকে কোথাও নিয়ে গিয়ে অপারেশন করা সম্ভব ছিল না। ঠিক হয় জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে দোতালার 'পাথর ঘর'-এর পূর্বদিকের বারান্দায় তৈরি করা হবে অস্থায়ী অপারেশন থিয়েটার। দিন ঠিক হয় ৩০ জুলাই। তিনি নাকি বারবার জানতে চেয়েছিলেন ডক্টর নীলরতন সরকারকে খবর দেওয়া হয়েছে কি না। প্রত্যুত্তরে বলা হয়েছিল তাঁর সঙ্গে কোনওভাবেই যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। আসলে সেই সময় স্ত্রী নির্মলা দেবীর মৃত্যুর পরে মানসিক ভাবে ভেঙে পড়েছিলেন ডাঃ সরকার। যথা সময়ে করা হল কবির শরীরে অস্ত্রোপচার। কিন্তু অস্ত্রপচারের পরও সুস্থ হলেন না তিনি। খবর কানে পৌঁছতেই কলকাতায় ছুটে আসেন নীলরতন সরকার। এসে দেখলেন কবিকে। কপালে হাত দিয়ে কী বুঝেছিলেন তা তিনিই জানেন। কাউকে কোনও কথা না বলে চলে গেলেন তিনি। হয়তো কবির দিন ফুরিয়ে এসেছে তা তিনি বুঝেছিলেন। তবে এই অস্ত্রপচারকে সমর্থন করেননি ডাঃ নীলরতন সরকার। তাঁরা ছিলেন আত্মার আত্মীয়, দুজন দু'জনের। কবি তাঁকে স্নেহভরে ডাকতেন 'নীলু' নামে। উৎসর্গ করেছিলেন 'সেঁজুতি' কাব্যগ্রন্থ। নিয়মিত কবিকে পরীক্ষা করা, বিদেশ যাওয়ার আগে স্বাস্থ্যপরীক্ষা, এককথায় কবির শারীরিক সমস্যার সব দায়িত্বেই ছিলেন নীলরতন। ডাক্তারের দার্জিলিংয়ের বাড়িতে প্রায়ই যেতেন রবীন্দ্রনাথ। দার্জিলিংয়ে শখ করে বাড়ি বানিয়েছিলেন নীলরতন, নাম দিয়েছিলেন 'গ্লেন ইডেন'।

ডাঃ নীলরতন সরকার, জন্ম ১৮৬১ সালের ১লা অক্টোবর। রবীন্দ্রনাথের জন্মের সাড়ে চার মাস পরে জন্মগ্রহণ করেন তিনি। পরবর্তীতে দুজনে হলেন পরম বন্ধু। ডায়মন্ড হারবারের কাছে নেত্রা গ্রামে মামার বাড়িতে জন্ম হয় নীলরতনের। বাবা নন্দলাল সরকার আর মা থাকোমণি দেবী। তাঁর বাবা যশোরের এক দরিদ্র পরিবার থেকে এসেছিলেন নেত্রায়। সাল ১৮৬৪, নীলরতনের বয়স তখন সবে তিন, ভয়ঙ্কর ঘূর্ণিঝড়ে ধ্বংস হল ভিটেমাটি। নেত্রার বাড়ি ছেড়ে পাঁচ ছেলে, তিন মেয়ে ও স্ত্রীকে নিয়ে নন্দলাল চলে এলেন জয়নগরে। এই জয়নগরেই স্থানীয় বাংলা মাধ্যম স্কুলে ভর্তি হয় ছেলেটি। এদিকে কিছুদিন পরে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় কার্যত টাকার অভাবে বিনা চিকিৎসায় মারা গেলেন মা থাকোমণি দেবী। চোখের সামনে মাকে ধুঁকে ধুঁকে মারা যেতে দেখে রোখ চেপে গেল ১৪ বছরের ছেলেটির। ডাক্তার তাকে হতেই হবে। এমন কিছু একটা তিনি করবেন যাতে গরিব মানুষের কাছে সুচিকিৎসা পৌঁছে যায়, বিনা চিকিৎসায় যেন আর কোন গরিব মানুষের মৃত্যু না হয়। ১৮৭৬ সালে জয়নগর হাই স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করলেন। ভর্তি হলেন শিয়ালদহের ক্যাম্পবেল মেডিক্যাল স্কুলে (পরবর্তীতে এনআরএস)। বাড়িতে অভাব। সংসার চালাতে শিক্ষকতা শুরু করলেন বড়দা অবিনাশচন্দ্র। আর এক ভাই যোগীন্দ্রনাথ সরকার। পরবর্তী কালে যিনি 'হাসিখুশি' লিখেছিলেন। নীলরতনও উপার্জনের জন্য শিক্ষকতা, জনগণনার কাজ ইত্যাদি করেছেন।

১৮৮১ সালে এলএমপি পাশ করলেন ভাল ভাবে। কিন্তু সেই সময় ব্রিটিশ আমলে মেডিক্যাল শিক্ষায় ছিল দ্বৈত ব্যবস্থা। নেটিভ ছাত্রদের জন্য বাংলায় পঠনপাঠন হত। অথচ মেডিক্যালের প্রায় সব বই ইংরেজিতে। ফলস্বরূপ অনেক কিছু অজানা, অধরা থাকত নীলরতনের। মনের খুঁতখুঁতানি কিছুতেই যেত না। বাংলা ভাষায় ডাক্তারি পাশ করা 'নেটিভ-ডাক্তার'দের জন্য নির্ধারিত ছিল অ্যাসিস্ট্যান্ট সার্জনের চাকরি। তা করতে অপমানিত বোধ করলেন তিনি। তাই পেশা বদলে গ্রে স্ট্রিটে, সরোজিনী নাইডুর বাবা অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায় স্থাপিত অঘোরনাথ বিদ্যালয়ে কিছু দিন শিক্ষকতাও করেন। সেই সময়ে সহকর্মী হিসেবে

পেয়েছিলেন নরেন্দ্রনাথ দত্তকে, পরবর্তীতে যিনি স্বামী বিবেকানন্দ হিসেবে পরিচিত হবেন। ক্রমে মেট্রোপলিটন কলেজ থেকে ১৮৮৩ সালে এলএ এবং ১৮৮৫ তে বিএ পাশ করেন। শ্রীরামপুরের কাছে চাতরা হাইস্কুলের প্রধানশিক্ষক হিসেবে কিছুদিন দায়িত্বও সামলান।

শিক্ষকতার জগতে গেলেও নীলরতনের ভাগ্যে ছিল ডাক্তারি। ক্যাম্পবেল স্কুলের তৎকালীন সুপার ম্যাকেঞ্জি সাহেবের সুপারিশে ১৮৮৫ সালে ভর্তি হয়ে গেলেন বেঙ্গল মেডিক্যাল কলেজে (যা এখন কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ)। তাঁর রেজাল্ট এত ভাল ছিল যে, পাঁচ বছরের ডাক্তারি কোর্সে সরাসরি তৃতীয় বর্ষে ভর্তি হলেন। মর্যাদাপূর্ণ 'গুড ইভ' বৃত্তি পেলেন পড়াশোনায় উৎকর্ষের জন্য। ১৮৮৮ তে কৃতিত্বের সঙ্গে এমবি পাশ করলেন। মেয়ো হাসপাতালে হাউস সার্জনশিপ করতে করতে এমএ এবং এমডি-র প্রস্তুতি শুরু করলেন। ১৮৮৯ সালে একই সঙ্গে দু'টি পরীক্ষাতেই সসম্মানে উত্তীর্ণ হলেন।

১৮৯০ সাল থেকে তাঁর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সময় শুরু হয়েছিল। ১৮৯০ সালে নীলরতন যখন এমডি হচ্ছেন, তার আগে মাত্র ছ'জন বাঙালি এমডি পরীক্ষায় পাশ করেছেন। তাঁরা হলেন চন্দ্রকুমার দে, মহেন্দ্রলাল সরকার, জগবন্ধু বসু, ভগবৎচন্দ্র রুদ্র এবং রামপ্রসাদ বাগচী। পাশ করার পরে তিনি চাকুরী ছেড়ে নিজের বাড়িতেই প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। প্রথম থেকেই চিকিৎসা পেশায় তাঁর সাফল্য ছিল অভূতপূর্ব। তাঁর পেশাগত দক্ষতা, তাঁর ব্যবহারিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলার ক্ষমতা, তাঁর রোগীদের প্রতি যত্ন এবং মনোযোগ দেওয়া এবং সর্বোপরি, তিনি তাদের মধ্যে যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে পেরেছিলেন তার জন্যে তিনি বিস্তৃত স্বীকৃতি অর্জন করেছিলেন। রোগীদের কাছে তিনি ছিলেন জীবন্ত ঈশ্বর। দু'হাতে বিপুল রোজগার করেছেন আবার স্বদেশি শিল্প গড়তে গিয়ে এক সময়ে প্রায় সর্বস্বান্ত হয়েছেন। কখনও গরিব রোগীকে অর্থাভাবে চিকিৎসায় প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর দরজা থেকে ফিরতে হয়নি। পথ থেকে তুলে এনে বহু মানুষকে বিনা পয়সার চিকিৎসা করেছেন। সে যুগ ছিল সাহেব ডাক্তারদের প্রবল প্রতাপের যুগ। দেশীয় চিকিৎসকেরা প্রায় কুঁকড়ে থাকতেন। কিন্তু নীলরতনের রক্তে ছিল প্রবল স্বদেশী জাত্যাভিমান। আর তাই দাপুটে বাঙালি চিকিৎসক চ্যালেঞ্জটা ছুড়ে দিতে পেরেছিলেন সাহেব ডাক্তারদের। দেশীয় চিকিৎসক হয়েও প্রাইভেট প্র্যাকটিস শুরু করলেন। তাঁকে অনুসরণ করলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু সার্জন সুরেশপ্রসাদ সর্বাধিকারীও, তিনিও শুরু করলেন প্রাইভেট প্র্যাকটিস। ব্রিটিশদের চোখ উঠল কপালে। নিজের ৭ নম্বর শর্ট স্ট্রিটের বাড়িতে তৈরি হল ছোট্ট একটা ক্লিনিক্যাল ল্যাবরেটরি। জুনিয়র ডাক্তারদের সেখানে নিজের হাতে কাজ শেখাতেন তিনি। সেখানেই সব রকমের রক্ত, মল, মূত্র, কফ এবং অন্যান্য দেহ তরলের পরীক্ষা-নিরীক্ষা হতো। অনেক কষ্টে সংগ্রহ করতেন বহু দামি উন্নত চিকিৎসার জন্য প্রয়োজনীয় বিদেশি যন্ত্রপাতি। ECG যন্ত্র ভারতে প্রথম তিনিই ওই বাড়িতে বসিয়েছিলেন। সংগ্রহ করতেন নিত্যনুতন দেশি-বিদেশি মেডিক্যাল জার্নাল, যাতে ছাত্ররা পড়তে পারে এবং চিকিৎসা জগতের নিত্যনূতন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত থাকে। তিনি ছিলেন উঁচুমানের গবেষক ও শিক্ষক। তাঁকে বলা হত 'ক্লিনিক্যাল মেডিসিনের জাদুকর'। ডাক্তার বিধানচন্দ্র রায় যখন মেডিক্যাল কলেজ থেকে মেডিসিনের পরীক্ষা দেন, তখন ডাঃ নীলরতন ছিলেন তাঁর পরীক্ষক। আজীবন তাঁদের অন্তরঙ্গ সম্পর্ক বজায় ছিল। ডাঃ নীলরতন সরকারকে গুরুর আসনে বসিয়েছিলেন ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়। বাঙ্গলাকে অসম্ভব ভালবাসতেন তিনি। ব্রিটিশ আমলে অখণ্ড বাঙ্গলার মেডিক্যাল কলেজগুলিতে একচ্ছত্র প্রভাব ছিল বিদেশি চিকিৎসকদের। নীলরতন চেয়েছিলেন বাঙ্গলার বুকে স্বদেশী মেডিক্যাল কলেজ গড়ে উঠুক। এই স্বদেশি মেডিক্যাল কলেজে দেশীয় চিকিৎসকেরা চিকিৎসা করবেন ও সেইসাথে মেডিক্যালের ছাত্রদের পঠনপাঠনের দায়িত্বও নেবেন। এক্কেবারে বাঙালি ছাত্রদের জন্য সম্পূর্ণরূপে স্বদেশী মেডিক্যাল কলেজ। সেই লক্ষ্যেই উৎসাহী হয়ে রাধাগোবিন্দ করের চেষ্টায় ১৮৮৭ সালে ১১৭ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটের বাড়িতে তৈরি হয় 'ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল'। আবার ১৮৯৫ সালে ১৬৫ নম্বর বৌবাজার স্ট্রিটে ভাড়াবাড়িতে নীলরতন, সুরেশ সর্বাধিকারী-সহ কয়েকজন মিলে প্রতিষ্ঠা করেন 'কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল'। এটিই ছিল ভারতের প্রথম বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ। শিক্ষার মাধ্যম ছিল ইংরেজি। ১৯০৪ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল স্কুল ও কলেজ অব ফিজিশিয়ানস অ্যান্ড সার্জনস অব বেঙ্গল মিলে একটাই প্রতিষ্ঠান হল ও স্থানান্তরিত হল বেলগাছিয়ায়। ১৯১৬ সালের ৫ জুলাই এখানেই তৈরি হল 'কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ'। পরবর্তী কালে যা 'আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ' নামে পরিচিত হয়। যদিও কোনও কোনও ইতিহাসবিদের মতে ১৯১৯ সালে এই কলেজের নাম হয়েছিল কারমাইকেল। তার আগে ১৯১৬-১৯ পর্যন্ত এর নাম ছিল বেলগাছিয়া মেডিক্যাল কলেজ। এই কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজের সরকারি অনুমোদন পাওয়া খুব সহজ ব্যাপার ছিল না। সেজন্য ডাঃ নীলরতন সরকার তৎকালীন ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের সঙ্গে দেখা করেন এবং মেডিক্যাল কলেজ সরকারি অনুমোদন ও বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতির কথা জানান। সাহেবও চতুরতার সাথে বললেন, 'আপনি যদি এক মাসের মধ্যে এক লাখ টাকা জোগাড় করতে পারেন তবেই ওই কলেজ হবে আর অনুমোদনও দেওয়া হবে।' সেই সময় এক লাখ টাকা অনেক টাকা। কিন্তু বাঙ্গালি চিকিৎসকের মাথায় তখন ''স্বদেশী মেডিক্যাল কলেজ'' তৈরির ভূত চেপেছে। সাহেবের চোখে চোখ রেখে চ্যালেঞ্জ নিলেন। নিজের জমানো টাকা তো আছেই তাছাড়া শহরের তাবড় ধনী, ব্যবসায়ী তাঁর রোগী। সবাই সাহায্যের হাত বাড়ালেন। বন্ধু রবীন্দ্রনাথও অভিজাত মহলে নিজের প্রভাব কাজে লাগিয়ে অনেক টাকা তুললেন। নীলরতন বাকিটা ধার করলেন বন্ধুদের থেকে। সময়সীমা শেষ হওয়ার আগেই সংগৃহীত টাকা হাতে বাঙ্গালি ডাক্তারকে ঢুকতে দেখে স্তম্ভিত হলেন সাহেব। কোনোক্রমে নিজেকে সামলে জিজ্ঞেস করলেন প্রস্তাবিত কলেজের নাম তাহলে কী হচ্ছে। নীলরতন হেসে উত্তর দিলেন, আপনার নামেই নাম হবে, ''কারমাইকেল মেডিক্যাল কলেজ''। কারণ তিনি জানতেন, স্বদেশি নাম হলে পদে পদে বাধা আসবে। বড়লাটের নামে হলে মুহূর্তে সব অনুমোদন মিলবে। আর হলও সেটাই। স্বদেশি আন্দোলনের ঢেউয়ে দেশীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্বীকৃতি পেল। পরবর্তীতে বাংলার ছোটলাট লর্ড কারমাইকেলের দুরারোগ্য ব্যাধি সারিয়ে তোলার জন্য এবং বাড়িতে তাঁর মেডিকেল গবেষণা ও অনুশীলনের সামগ্রিক অবদানের জন্য ব্রিটিশ সরকার তাঁকে নাইট উপাধিতেও ভূষিত করেন।

এছাড়া নীলরতনের চেষ্টায় তাঁর এক ধনী রোগী তারকনাথ পালিতের সার্কুলার রোডের জমিতে ১৯০৬ সালে জন্ম নিল বেঙ্গল টেকনোলজিক্যাল ইনস্টিটিউট। পরবর্তী কালে এটি যাদবপুরে স্থানান্তরিত হয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের রূপ নেয়। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার জন্য ১৯১৯ থেকে ১৯২১ সাল পর্যন্ত তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য করা হয়। ১৯২০ সালে তিনি ইমিপিরয়াল ইউনিভার্সিটি কমিশনে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করার সুযোগ পান। এই সময়েই তিনি লন্ডন যাত্রা করেন। তাঁর যোগ্যতার পরিচয় পেয়ে অক্সফোর্ড ও কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি সি এল এবং ডি এল উপাধি দিয়ে সম্মানিত করেন। দেশে ফিরে তিনি দেশহিতকর কাজে

অধিকাধিক মননিবেশ করেন। কলকাতায় যক্ষ্মা হাসপাতালের জন্য ১৯২৩ সালে ক্যালকাটা মেডিক্যাল এইড সোসাইটি তৈরি হয়। তার সভাপতি ছিলেন নীলরতন এবং অবৈতনিক সম্পাদক ছিলেন ডাক্তার কুমুদশঙ্কর রায়। তাঁদের আগ্রহে ১৯২৮ সালে গড়ে ওঠে কলকাতার প্রথম যক্ষ্মা হাসপাতাল। যা পরে কুমুদশঙ্কর রায়ের নামে নামাঙ্কিত হয়। পরবর্তীতে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন ক্যালকাটা মেডিক্যাল ক্লাব।

১৮৮৮ সালে নীলরতন পূর্ববাংলার ব্রাহ্ম মিশনারি গিরিশচন্দ্র মজুমদারের কন্যা নির্মলা দেবীকে বিয়ে করেন এবং ব্রাহ্মধর্ম গ্রহণ করেন। দুজনের পাঁচ কন্যা ও এক পুত্র। ভারতীয় সাংবাদিকতার জনক তথা 'প্রবাসী' পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল তাঁর। নীলরতন তাঁর মেয়ে অরুন্ধতীর সঙ্গে রামানন্দের ছেলে কেদারনাথের বিয়ে দিয়েছিলেন। ডাঃ নীলরতন সরকার ছিলেন স্বনামধন্য রাশিবিদ তথা বিজ্ঞানী প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের আপন মামা। বোন অল্প বয়সে মারা যাওয়ার পরে শিশু প্রশান্তচন্দ্র ও তার ভাইবোনদের নিজের কাছে এনে মানুষ করেন। প্রশান্তচন্দ্রের বিয়ের সময় কনের পিতার জায়গায় বিয়ের অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন স্যার নীলরতন সরকার, পি সি মহলানবীশের মামা। ১৯৪৩ সালে নীলরতনের মৃত্যুর পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে স্মরণসভায় স্মৃতিচারণায় প্রশান্তচন্দ্র বলেন, 'রাজারাজড়ার ঘরেও যেমন তার যাতায়াত ছিল, অন্যদিকে নিতান্ত সব সামান্য লোকের ঘরেও ঠিক তেমন করেই তিনি যেতেন চিকিৎসা করতে। তাঁর কথায়, ব্যবহারে, চেহারায় ছিল অগাধ ভরসা। কী করে রোগীর মন প্রফুল্ল হয়, সে দিকে তাঁর লক্ষ্য থাকত। মরণাপন্ন রোগী পাশে গিয়ে যখন দাঁড়াতেন, তখন তাঁর সেই বরাভয় মূর্তি দেখে সকলের মনে আশার সঞ্চার হত। সবার মনে এক কথা 'নীলরতন সরকার যখন আসছেন, আর কোনও ভয় নেই!' এক কথাই 'ধনন্তরী' চিকিৎসক ছিলেন স্যার নীলরতন সরকার।

এ কথা অনেকেই জানেন না যে, অস্থি সংক্রান্ত চিকিৎসায় এক্স-রশ্মির ব্যবহার ভারতে ডাঃ সরকারই প্রথম করেন। ১৮৯৫ সালে রন্টজেন এক্স-রশ্মি যন্ত্র আবিষ্কার করার পর সেই সংক্রান্ত তথ্যাদি জগদীশচন্দ্র জেনে (কিন্তু যন্ত্রটি না দেখেই) কয়েক মাসের মধ্যে প্রেসিডেন্সি কলেজে একটি এক্স-রে যন্ত্র তৈরি করে ফেলেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন ডা. নগেন্দ্রচন্দ্র নাগ। তিনি তখন প্রেসিডেন্সির রসায়ন বিভাগে ছিলেন। ডা. নাগ পরে বসু বিজ্ঞান মন্দিরের ডেপুটি ডিরেক্টর হয়েছিলেন। ডাঃ সরকারের সঙ্গে জগদীশচন্দ্রের ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্ব ছিল। জগদীশচন্দ্রের তৈরি করা এই যন্ত্র নীলরতন সরকার অস্থি চিকিৎসার কাজে লাগান। ১৮৯৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা একটি চিঠিতে জগদীশ চন্দ্র বোস লিখেছিলেন, ''if possible please come to the Presidency College at 8 in the morning. I have to examine a patient using Roentgen kol (machine)–he has broken his back. You may feel that this is not as dangerous as malaria which is prevalent in this country. I too had mentioned this but could not avoid Dr. Nilratan Sorcar's request. In case you can not go to the college, come directly to no 85 at 9. I will be back by then'' যদিও মাহেন্দ্রলাল সরকারের চেষ্টাই ১৮৯৬ সালের ২৩ জুন কলকাতাতে ভারতে প্রথম সফল এক্স-রে ছবিটি তৈরি করা হয়।

ডাঃ সরকার নিজেকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখতেই ভালবাসতেন। সংসারের হাটে ঠেলাঠেলি তিনি করেননি। কখনও তাঁকে পরনিন্দা, পরচর্চা করতে শোনা যায়নি। তাঁর সামনে কেউ তাঁর সহকর্মী বা অন্য কারও নিন্দা করলে বিরক্ত হতেন, থামিয়ে দিতেন। প্রশান্তচন্দ্রের কথায়, কম বয়সে নীলরতন যখন একবার হাসপাতালে কাজ করছেন, তখন গভীর রাতে এক রোগী এলেন। পরীক্ষা করে বুঝলেন, 'অবস্ট্রাকশন অব দ্য ইন্টারস্টেইনস'। অস্ত্রোপচার ছাড়া গতি নেই। কিন্তু অত রাতে সার্জন পাওয়া যাবে না। তিনি আবার মেডিসিনের চিকিৎসক। অস্ত্র চিকিৎসা করতেন না। সেদিন তবুও নিজেই অস্ত্রোপচার করে রোগীর প্রাণ বাঁচান।

জীবনের শেষদিকে, তিনি স্বাস্থ্য নিয়ে বেশ উদ্বেগে ছিলেন এবং কিছুটা আর্থিক সমস্যায় পড়েছিলেন। ১৯৩৯ সালের আগস্টে স্ত্রী নির্মলা দেবীর মৃত্যু হয়। তাঁর স্ত্রীর মৃত্যু তাকে মারাত্মক আঘাত হেনেছিল। তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছিলেন এবং ১৯৪০ সালের জানুয়ারিতে তাঁর একটি স্ট্রোক হয়। শেষটি হয়েছিল ১৮ মে, ১৯৪৩ সালে গিরিডিতে। নিমেষে সবকিছু শান্ত। ১৯৪৩ সালের ১৮ মে শুক্লা চতুর্দশীর দুপুরে অবসান হল তাঁর জীবনের। উশ্রী নদীতীরে বালির উপরে চিতা সাজানো হল। তিনি গরিব হয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং দরিদ্র হয়ে মারা যান।

গোয়াতেই বিশ্বের সব সেরা সৈকত

সুজিত চক্রবর্তী

পর্তুগীজ ভাষায় 'ডোনা' শব্দের অর্থ কুমারী। আরব সাগরে কুমারী ডোনারম তাই নিজেকে উজার করে দিতে চায় জুয়ারি নদী। পানাজি শহর থেকে ৭ কিমি পশ্চিমে হাতুড়ির মতো দেখতে ল্যাটারাইট নির্মিত টিলা। তিন দিক সমুদ্র বেষ্টিত। এর উপরে দাঁড়ালেই আরব সাগরের উদ্দাম আহ্বান। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন? আমি গোয়ার কথাই বলছি। এদেশের ক্ষুদ্রতম রাজ্যটি ভ্রমণার্থীদের কাছে এক অপার বিস্ময় সমুদ্র সৈকতভূমি। প্রেম যেন গোয়ার আকাশে বাতাসে, সাগরের নীলে সোনাঝরা সৈকতে প্রথমে মনে আসে ডোনা পাওলা সী বিচে জলের উদ্দাম আহ্বান। গোয়া বলতে খোলামেলা সৈকত যাপনের হাতছানি। অপার সব রত্নরাশি খুঁজে পাবেন যে মন বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে উঠবে। গির্জা, মন্দির, অভয়ারণ্য, দুর্গ, পাখিরালয় আর অবশ্য বিখ্যাত সব সমুদ্র সৈকত। কী নেই গোয়ায়। শুধু আন্তরিকভাবে খুঁজে নেওয়ার অপেক্ষা। পশ্চিমঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত সহ্যাদ্রি পর্বতের কোলে অবস্থিত এই ছোট্ট রাজ্যটি। সহ্যাদ্রি পর্বত থেকে ছয় নদী নেমে এসে পাড়ি দিয়ে এসে পড়েছে আরব সাগরে। ১০৫ কিমি দীর্ঘ গোয়ার সমুদ্র সৈকত ছ-নদীর মোহনায় হয়ে উঠেছে মোহময়ী। কাজু, আম, কাঁঠাল এবং নারিকেল গাছে আচ্ছাদিত ঘন সবুজের দেশ এই গোয়া। গোয়াতেই বিশ্বের সব সেরা সৈকত। গোয়া তাই বরাবরই দেশি বিদেশি পর্যটকের সরগরম। নৈশজীবনে গোয়ানিজরা খুবই আমুদে। বছরে প্রায় ৯ মাস চলে বিভিন্ন উৎসব। কয়েক দশক আগেও গোয়া ছিল কেন্দ্রশাসিত। ১৯৮৭ সালে ৩০ মে পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা পায় গোয়া। গোয়াকে দুটি ভাগে ভাগ করতে হবে দর্শনীয় বিচগুলি দেখবার জন্য। এক উত্তর গোয়া-এর দর্শনীয় মায়েম লেক, তিন দিকে তিন টিলা বিশাল পাহাড়। ঘন সবুজে ঘেরা। মাঝখানে নির্মল নীল জলের হ্রদ হয়ে পানাজি, মাপুসা, আগুয়াদা দুর্গ, শ্রীসপ্তকোটেশ্বর মন্দির, টেরেমোল দুর্গ, ভগবান মহাবীর অভয়ারণ্য, সেলিম আলি পখিরালয় ইত্যাদি। এছাড়া দেশের সেরা সৈকতভূমি হল ভাগাতোর বিচ। অসংখ্য সিনেমার শুটিং হয়েছে। বিদেশি সৈকতের কথা মনে করিয়ে দেয়। রয়েছে বিখ্যাত আনজুনা বিচ, যা রয়েছে ভাগাতোর হতে দক্ষিণে অবস্থিত। ঝামা পাথরের সৈকত। ঢেউ খুব তীব্র এখানে নারকেল বন নেই সেভাবে। বহু বিদেশির সমাগম হয়। রয়েছে গোয়ার সৈকতের রানি কালাগুটে। নীল সবুজের সুন্দর মেলবন্ধন। সানবাথে ব্যস্ত বিদেশিরা। পানাজি থেকে ১৬ কিমি দূরে। এই বীচ খুব জমজমাট। আর রয়েছে পানাজি থেকে ৫০ কিমি উত্তরে এক সৈকত আরামমেবেলি। পর্যটন নিগমের ব্যবস্থাপনায় ঘুরে আসা যায়। মিষ্টি জলের এক সুন্দর সরোবর রয়েছে এখানে। এবার আসা যাক দক্ষিণ গোয়ায়। সেখানে সবচেয়ে বিখ্যাত সী বিচ রয়েছে ডোনা পাওলা। যার প্রেমকাহিনি দিয়েই ঘেরা এই শহরটি। রয়েছে মন্দির, মসজিদ, মারগাঁও, লর্ড টোলিম, দুধসাগর, ভাস্কো-ডা-গামা বন্দর। বিখ্যাত বিচগুলির মধ্যে ডোনা পাওলা, আগোন্ডা যা মারগাঁও থেকে ৩৫ কিমি. দূরে নির্জন, নিভৃতে সুন্দর সৈকতভূমি। রয়েছে পালোলেম বিচ।

কীভাবে যাবেন : হাওড়া স্টেশন থেকে মুম্বাই মেলে মুম্বাই। এছাড়া গীতাঞ্জলি; জ্ঞানেশ্বরী এক্সপ্রেস ও হাওড়া কুরলা এক্সপ্রেসে মুম্বাইতে গিয়ে কোঙ্কন রেলপথেই গোয়া যাওয়ার পক্ষে আদর্শ। জনশতাব্দী মুম্বাই থেকে দাদার দিয়ে গোয়ার মারাগাঁওতে পৌঁছায় সবচেয়ে কম সময়ে। এছাড়াও অনেক ট্রেন রয়েছে। আপনাদের সুবিধা ও পছন্দমতো ট্রেন বেছে নিয়ে ঘুরে আসুন। এছাড়াও মুম্বই থেকে গাড়িতে কিংবা বাসে করে গোয়া পৌঁছানো যায় খুব সহজেই। নিজেরা ঘুরতে চাইলে অসুবিধা কিছুই নেই। তবে গোয়া পর্যটকদের কনডাকটেড ট্যুরে ঘোরার পক্ষে বেশ ভাল। অক্টোবর থেকে মার্চ-এর মধ্যে গোয়া ঘোরার পক্ষে আদর্শ।

কোথায় থাকবেন : এই একটা ব্যাপারে অপর্যাপ্ত সরবরাহ রয়েছে গোয়ায় তা ওল্ড গোয়া হোক বা নিউ গোয়াই হোক না কেন? সবরকম মানের ও দামের হোটেলের ছড়াছড়ি এখানে প্রতিটি শহর ও সৈকতে। এছাড়াও

রয়েছে সরকারি, বেসরকারি, পর্যটনের লজ, হলিডে হোম। আদি গোয়ার বাসিন্দারা ঘরও ভাড়া দেয় পর্যটকদের থাকার জন্য। তাই কোনও অসুবিধে নেই এখানে থাকার ও খাওয়ার। সবরকম খাবারই পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে জনপ্রিয় সি-বিচ কোভালাম বিচ

দক্ষিণ ভারতের সবচেয়ে সেরা বা ভারতের সমুদ্র সৈকতগুলির মধ্যে অন্যতম লোভনীয় সৈকতভূমি ও বেলাভূমির দেখা মিলবে এই কোভালামেই। এখানে সূর্যাস্তের ছবি এক বিরল অভিজ্ঞতা। দেখা মিলবে জোৎস্না রাতে নির্জনতার মাঝে একা নিজেকে বিলিয়ে দিলে পাবেন জীবনের এক অদ্ভুত অভিজ্ঞতা যা জীবনের স্মৃতিকোটায় এক অনন্য স্বপ্ন।

কী দেখবেন : কোভালামে দেখার বলতে একটাই তা হল সমুদ্রের অসাধারণ সৌন্দর্য। তার মধ্যে থাকছে অবশ্যই সূর্যাস্ত। বিশেষ করে ভরা জোৎস্নায় একটা রাত না কাটালে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে বঞ্চিত হবেনই এটুকু বলতে পারা যায় জোর গলায়। আর একটা কথা অবশ্যই মনে রাখবেন যে কোভালামে সি ফুড খেলে ভাল হোটেল ছাড়া খাবেন না। এখানকার তিনটি বিচ লাইট হার্বস, অশোক ও হাওয়া বিচও সমান সুন্দর। এগুলো দেখতে ভুলবেন না অবশ্যই।

কীভাবে যাবেন : হাওড়া থেকে সরাসরি ত্রিবান্দ্রম যাবার অনেক ট্রেন আছে যেমন—হাওড়া-ত্রিবান্দম এক্সপ্রেস, গুয়াহাটি ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসে করে ত্রিবান্দ্রম স্টেশনে নামুন তারপর ত্রিবান্দ্রম ইস্ট ফোর্ট বাস স্ট্যান্ড থেকে কোভালাম যাওয়ার বাস পাবেন প্রচুর। দূরত্ব মাত্র ১৬ কিমি। অটো করেও যেতে পারেন অনায়াসে এই বিরল সুন্দর সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে।

কোথায় থাকবেন : অনেকের ধারণা যে কোভালাম খুবই খরচ সাপেক্ষ। বাস্তবে কিন্তু তা নয়। অনেক ধরনের বাজেটের হোটেল, রিসর্ট আছে এখানে। যা ধনী থেকে মধ্যবিত্ত সকলের কাছেই লোভনীয়। একটু দামদর করে নিতেই হবে।

বাড়তি কিছু খবর : কোভালাম-এর সিজন হল, আগস্ট থেকে নভেম্বর মাস। আর ডিসেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি হল পিক সিজন একেবারে। মার্চ ও সেপ্টেম্বর হল অফ্ সিজন। সিজনের হোটেলের রেট প্রচন্ড বেড়ে যায়। অফ সিজনে আবার এর দামে ৪০--৫০ শতাংশ ছাড় মেলে। খুব দামী হোটেল ও পর্যটন নিগমের হোটেল ছাড়া সব হোটেলেরই চেক আউট টাইম হল ২৪ ঘণ্টা করে। সমুদ্র ভরা দক্ষিণ ভারতে এই কোভালাম সি বিচটি একেবারেই আলাদা সুন্দরভাবে নিজস্বতা নিয়ে সকলের সেরা হয়ে গেছে। তাই দক্ষিণ ভারত সফরে একে একবার দর্শন করা দরকার সব পর্যটকদের।

দমনের বিখ্যাত দেবকা বিচ ও জামপোর বিচ

গোয়া-দমন-দিউ। এই তিনটি নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হত বা বোধকরি এখনও হয়ে থাকে। গোয়ার মতো দমনও ছিল পর্তুগিজদের দখলে। তবে ১৯৮৭ সালে গোয়া আলাদা রাজ্য হওয়ার পর দমন আর দিউ এখনও কেন্দ্রের শাসনে রয়েছে।

দমনের দুটি অংশ একটি নানি দমন আর দ্বিতীয়টি মোতি দমন। দমনে দর্শনীয় স্থান প্রচুর হলেও এর প্রধান আকর্ষণ হল মোতি দমন দুর্গ ও আরব সাগর-এর কোল। এখানে সাগরের রূপ শান্ত। বিখ্যাত বিচগুলি হল দেবকা বিচ ও জামপোর বিচ। সমুদ্র এখানে বহু দূরে চলে যায় আর বিচের বালির রঙও কিছুটা কালো। প্রচুর বিদেশি পর্যটকদের আগমন ঘটে এই দমনে। এছাড়া দমনে সত্য সাগর উদ্যান বা কাদাইয়া লেক খুব সুন্দর করে তৈরি করা একটি লেক। এখানে বোটিং করার ব্যবস্থাও রয়েছে। বাড়তি পাওনা হিসেবে রয়েছে রেস্টুরেন্ট। তাই দমনের এক আলাদা আকর্ষণ রয়েছেই। চলে আসি এবার দিউ-এর বুকে।

কীভাবে যাবেন : হাওড়া থেকে ট্রেনে সুরাট। হাওড়া- আমেদাবাদ এক্সপ্রেস। দিল্লি ও মুম্বাই থেকেও আমেদাবাদ যাবার পথে ট্রেনে সুরাট পৌঁছানো যায়। এই সুরাট থেকে দমনে যাবার সুবিধাজনক ব্যবস্থা হল ট্রেন। পোরবন্দর থেকে ওখা, গান্ধীধাম, রাজকোট হয়ে মুম্বাই সেন্ট্রালগামী সব ট্রেনেই সুরাট হয়ে আপনাকে নামতে হবে ভাপিতে। সুরাট থেকে ভাপির দূরত্ব ৯৫ কিমি আর এই ভাপি থেকে দমন-এর দূরত্ব ১৩ কিমি। বাস, অটো, ট্যাক্সি, ভাড়া গাড়ি সবই পাওয়া যাবে এই ভাপি থেকে দমনে যাবার জন্য।

কোথায় থাকবেন : ছোট জায়গা হলেও দমন পরিচ্ছন্ন শহর নয় কিন্তু। তাই ওরই মধ্যে আছে নানি দমনে দেবিকা বিচের কাছাকাছি নানান ধরনের হোটেল। অর্থাৎ বড়লোক এবং মধ্যবিত্ত সকলের উপযুক্ত প্রচুর হোটেল, রিসর্ট ও সরকারি লজ রয়েছে। বেছে নেবার দায়িত্ব আপনার নিজের। তাই থাকার কোনও অসুবিধা নেই পকেটে টাকা থাকলেই হল।

সমুদ্র প্রেমিকদের স্বর্গ গোপালপুর সি বিচ

ভিড় থেকে একটু দূরে শান্ত, স্নিগ্ধ, মনোরম নির্জনতার মাঝে যদি হারিয়ে যেতে চান, চান যদি একটু নিরিবিলি বিশ্রাম তাহলে ঘুরে আসতে পারেন গোপালপুর সি-বিচে। সমুদ্র সৈকতে আছড়ে পড়া ঢেউয়ের দিকে তাকিয়েই দিন কোথা দিয়ে কেটে যাবে আপনার জানতেই পারবেন না। তবে হ্যাঁ, এটা অবশ্যই সতর্ক বাণী এবং মনে রাখবেন যে 'গোপালপুর সি ইজ নট দ্যাট সেফ'। পুরী বা দীঘার তুলনায় একটু সতর্ক থাকাই ভাল। ভাল করে জেনে নিয়ে সমুদ্রের কোন দিকটা স্নানোপযোগী তা বুঝেই জলের সাথে খেলা করতে নামবেন। চারদিকে সবুজ ও নীল রং-এর জল আর কালো মেঘে ঢাকা থাকে বেশির ভাগ সময়। তাই এই সমুদ্রও হয় রক্তাভ

কালচে। পাড়ে বসে একমনে ঢেউ এর পর ঢেউ গুনতে ভালই লাগবে আপনার। সঙ্গে অবশ্যই প্রকৃতি পাগল মনকে নিয়ে বেরুবেন। বর্ষাকালেও এখানে খুব ভাল বৃষ্টিপাত হয় না। বর্তমানে গোপালপুরের সমুদ্র ইকোলজিক্যাল ব্যালেন্স হারাচ্ছে। কিছু অসাধু ব্যবসায়ী সমুদ্র পাড়ের ঝাউ, দেবদারু, ইউক্যালিপটাস, কাঁটাঝোপের গাছগুলিকে কেটে নষ্ট করছে নানান ব্যবসার উদ্দেশ্যে। ফলে সমুদ্র তার ভারসাম্য হারাবে ক্রমশই। গোপালপুরেই রয়েছে বিখ্যাত ওবেরয় পাম বিচ। যা নবদম্পতির কাছে হানিমুনের ট্যুরটি কাটিয়ে আসতে পারা যায় অনায়াসেই। দেখবেন পাম বিচের হানিমুনের স্মৃতি চিরদিন আপনাকে আনন্দমুখর করে তুলবে সেই সোনা ঝরা দিনের স্মৃতি বিচরণ করতে করতেই। বিকেলে লাইট হাউসের ওপর থেকে কোস্ট লাইনটার রূপটা দেখতে ভুলবেন না কখনও। দেখতে সত্যিই অপূর্ব। দেখে আপনার মনে হবে মসৃণ অবতরনের মুহূর্তে কোন উড়ানোর ছবি। ভোররাতে হেমন্তর মৃদু ঠান্ডা সুবাস, সূর্যোদয় ও নীলাভ জলে সোনালি রঙের বর্ণোচ্ছটা আপনাকে টানবেই বারবার এই গোপালপুরের সমুদ্র সৈকতের উদ্দেশ্যে।

কীভাবে যাবেন : গোপালপুর সি-বিচ যাবার সহজ পথ হল কলকাতা থেকে ট্রেনে চেন্দ্রেপ ওড়িশার বেরহামপুর স্টেশন হয়ে। আসলে ব্রহ্মপুর উচ্চারণটি ওখানকার বলার কায়দায় হয়ে গেছে বেরহামপুর। হাওড়া থেকে মাদ্রাজ মেলে (চেন্নাই মেল) চেপে ১২ ঘণ্টা ট্রেন যাত্রা করে পরদিন সকালবেলায় বেরহামপুর স্টেশনে। স্টেশনের বাইরেই অপেক্ষা করছে অটো রিকশা। অ্যাম্বাসাডার ও জিপ গাড়ির মেলা। অটো ভাড়া মোটামুটি ৮০–১০০ টাকা। জিপ ও অ্যাম্বাসাডরের ভাড়া দরদাম করে ঠিক করে নেওয়াই ভাল। শুরু হক পথ চলা সোজা আপনাকে আধ ঘণ্টাখানেক চড়াই উতরাই রাস্তার মাঝে দিয়ে নিয়ে যাবে। দেখতে পাবেন প্রকৃতির সে এক সৌন্দর্য্যময় বিচিত্ররূপ। গাড়িটি আপনাকে সোজা সমুদ্রের বালিতে নিয়ে গেছে কখন তা মনেই করতে পারবেন না প্রকৃতির খামখেয়ালী শোভা দেখতে দেখতে। সঙ্গে সঙ্গেই পাবেন এক মন মাতানো ঝোড়ো বাতাস, সংগে জল ও পরিবেশ মিশ্রিত অদ্ভূত এক মন কাড়া নেশার গন্ধ।

কোথায় থাকবেন : গোপালপুর সি-বিচ-এর ধার দিয়ে রাস্তার এক পাশে অনেক অসংখ্য সারি সারি হোটেল, লজ, গেস্ট হাউস ও ট্যুরিস্ট বাংলো গড়ে ওঠেছে। এছাড়া এখানে আই.টি.সি-র, টাটা সহ বেশ নামিদামি কোম্পানির গেস্ট হাউসও রয়েছে এই স্থানে। তবে এখানে স্মার্ট, চটপটে অভিজ্ঞ না হলে ঘর পাওয়া ও কেয়ারটেকারদের ম্যানেজ করা অসুবিধা আছে। তাই আগে বুক করে যাওয়াই ভাল। এছাড়াও রয়েছে যাত্রীনিবাস অনেকগুলো। ছোট ঘর-এর ভাড়া ২০০ টাকা থেকে ৩৫০ টাকার মধ্যে। তবে দরদাম করতে হবে অবশ্যই নয়তো বেশি পড়ে যেতে পারে। গোপালপুর সি-বিচ এমন এক স্থান যে বারো মাসই ঘর পাওয়া যায় আবার বুকিং করে না আসলে অসুবিধাও ভোগ করতে হয়। কারণ এখানে বেছে বেছে আসা ট্যুরিস্টদের আগমন। তাই সংখ্যায় কম হলেও ঘরের সংখ্যা অবশ্যই কম পড়তে পারে। হানিমুন স্পেশাল পাম বিচের ঘর ভাড়া একার জন্য ৪০০০ টাকা এবং দুজনের জন্য ৫০০০ টাকা প্রায়, তবে হানিমুন তো একবারই হয় তাই না?

পশ্চিমবঙ্গে জনপ্রিয় সি বিচ দীঘা

দৈনন্দিন কাজের চাপে যখন আমরা জেরবার, মানসিক ক্লান্তি, ইট, বালি, কংক্রিটের শহরে যখন একটু নিশ্বাস নিতেও অসুবিধা হয় তখন দেহ, মনের ক্লান্তি কাটাতে পশ্চিমবঙ্গের সবচেয়ে জনপ্রিয় কাছের সমুদ্র সৈকতবাস দীঘার জুড়ি মেলা ভার। তখন সমুদ্র এনে দেয় নতুন করে উজ্জীবিত হয়ে ওঠার রসদ। তাই বাঙালির কাছে দীঘা সাগর সন্ধানে সবচেয়ে নাগালের মধ্যে। পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ৭০ কিমি তীরভূমির আহ্বানে বারবার ফিরে আসে ভ্রমণপিপাসুরা। দীঘা মানেই ওল্ড এবং নিউ। বর্তমানে ওল্ড দীঘাতে জলোচ্ছ্বাস প্রবল। তাই তীরভূমি প্রায় নেই। সমুদ্র এখানে বাঁধ দিয়ে বাঁধানো পুরো এলাকা। সমুদ্রের পালগপনা দেখতে ওল্ড দীঘায় আসেন অনেকে। বাঁধে দাঁড়ালে সফেন সমুদ্র পা ছুঁয়ে যায়। তাই সমুদ্র স্নানের জন্য আদর্শ জায়গা নিউ দীঘা। শান্ত সমুদ্র, বিস্তীর্ণ তীরভূমি। সারি সারি ঝাউ বনে ঘেরা, সোনালি নীল উদ্দাম সমুদ্র। সমুদ্রই দীঘার মূল আকর্ষণ হলেও রয়েছে অমরাবতী লেক। পুরো লেকের সৌন্দর্য্য উপভোগ করুন ও প্যাডেল বোটে ভেসে বেড়ান পুরো লেককে ঘিরে। এছাড়া রয়েছে দীপক মিত্রের স্নেক পার্ক, দীঘা বিজ্ঞান কেন্দ্র। রয়েছে এখানে বিজ্ঞান কেন্দ্রের উন্মুক্ত প্রাঙ্গনে রয়েছে ম্যাজিক বল, আর্কিমিডিয়া সূত্র, টস অফ কয়েন। আরও কত কি? বিশাল কাজু বাগানটি রয়েছে ঠিক এর বিপরীত দিকে। জীবন বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয় এখানে কত সহজ ও সুন্দরভাবে বোঝানো হয়েছে। বেলাভূমিতে বিনোদনের পাশাপাশি চলে যেতে পারেন উড়িষ্যা বর্ডারে চন্দনেশ্বর মন্দির দর্শনের উদ্দেশ্যে।

কীভাবে যাবেন : এখনও দীঘা যাবার প্রধান অবলম্বন হল সড়কপথ। তবে বর্তমানে হাওড়া, শালিমার থেকে রেল লাইনের পথে ট্রেন চালু হয়ে যাওয়ার জন্য ধকল অনেকটাই কমেছে। প্রতিদিন কলকাতা থেকে অজস্র সরকারি, বেসরকারি, বেঙ্গল কর্পোরেশনের বাস স্ট্যান্ড ধর্মতলা থেকে সকাল থেকে রাতেও ছাড়ছে। এছাড়াও দমদম, বেলঘরিয়া, বারাসাত, হাওড়া, হাসনাবাদ, ঠাকুরপুকুর, হাওড়া থেকে স্টেট ট্রান্সপোর্টের ও সাউথ বেঙ্গল কর্পোরেশনের বাস স্ট্যান্ড থেকে নিয়মিত যাতায়াত করে বাস দীঘার উদ্দেশ্যে। আবার হাওড়া থেকে মেচেদা স্টেশনে নেমে বাস ধরে দীঘা যাওয়া যায়। তবে এখন সবচেয়ে আরামদায়ক হল হাওড়া স্টেশন, শালিমার স্টেশন থেকে প্রতিদিন রয়েছে কয়েকটি ট্রেন। সময় লাগে প্রায় সাড়ে চার ঘণ্টা। সুতরাং ট্রেন যাত্রাই সবচাইতে উপযুক্ত বলে ভাবা যায়।

কোথায় থাকবেন : দীঘায় প্রায় চারশোর বেশি ছোট বড় হোটেল আছে। সরকারি বিভিন্ন দপ্তরের অতিথি নিবাসও রয়েছে অসংখ্য। এছাড়াও বিভিন্ন সংস্থার হলিডে হোমেও থাকা যায়। সরকারি অতিথিশালার জন্য কলকাতা থেকে বুকিং করা যায়। ছোট বড় হোটেলগুলি বড়লোক ও মধ্যবিত্তদের জন্য যথাযত। সবগুলিই সুন্দর পরিষ্কার। খুব বেশি খরচ সাপেক্ষ নয় দীঘা সৈকতভূমি। দিন তিনেকের জন্য অনায়াসেই ঘুরে আসতে পারেন সপরিবারে। কারণ থাকা ও খাওয়ার খরচ আপনার আয়ত্বের মধ্যেই। দীঘার কিছু প্রয়োজনীয় ফোন নম্বর ঃ দীঘা থানা—০৩২২০-৬৬২২২, দীঘা ট্যুরিস্ট লজ—৬৬২৫৫, দীঘা বাস ডিপো—৬৬০১৩।